পঞ্চম অধ্যায়

ভাষাচিন্তায় রাজশেখর ঃ প্রবন্ধের আলোকে

রসায়ণ বিজ্ঞানী তথা ভাষাবিদ্ রাজশেখর বসু বিজ্ঞান নিয়ে তিনি যেমন গবেষণায় ব্যস্ত তেমনি ভাষার বিভিন্ন বিভাগ অক্ষর বানান শব্দ প্রভৃতির প্রতি ক্ষেত্রেও তিনি অনসন্ধিৎসু গবেষক। তাই ভাষাবিদ্ ''অভিধান প্রণয়নে, শব্দ-নির্বাচনে, শব্দে অর্থ-নির্দেশে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অর্থের বিবর্তন প্রকাশে যে যৌক্তিকতা, যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তির আবশ্যকতা অপেক্ষিত, সেটী শাস্ত্রাধিকারী বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুর্লভ বস্তু''[১] — এই সমস্ত গুণের অধিকারী রাজশেখর বসু। এই অধ্যায়ে ভাষা নিয়ে লেখকের বিভিন্ন গবেষণাগুলিকে আমরা একসূত্রে গ্রন্থিত করার চেষ্টা করেছি।

১) বাংলা অক্ষরের সংস্কার (১৯৪৪)

২) বাংলা বানান (১৯৪৪)

৩) বানানের সমতা ও সরলতা (১৯৫৭)

৪) বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৩৫)

৫) বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ (১৯৪০)

৬) বাংলা ভাষার গতি (১৯৫৩)

৭) সাধু ও চলিত ভাষা (১৯৩৩)

৮) গ্রহণীয় শব্দ (১৯৫৮)

৯) বিদ্যালয়ের বাংলাভাষা (১৯৫২)

১০) বাঙালীর হিন্দীচর্চা (১৯৫১)

১১) সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৫৬)

১২) ভুল নাম ও নকল জিনিস (১৯৫৬)

১৩) বাংলা সাইক্লোপিডিয়া (১৯৫৫)

১৪) ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার (১৯৫০)

১৫) রবীন্দ্র রচনার বানান (১৯৪৩)

১৬) ভাষা ও সংকেত (১৯৩১)

১৭) বাংলা পরিভাষা (১৯৩৩)

১৮) সরকারী পরিভাষা (১৯৪৮)

১৯) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (১৯৫১)

২০) আচার্য উপাচার্য (১৯৫৭)

২১) বাংলা ছন্দের শ্রেণী (১৯৪৫)

২২) বাংলা ছন্দের মাত্রা

২৩) ভাষার বিশুদ্ধি (১৯৪৩)

বাংলা অক্ষরের সংস্কার (১৯৪৪)

যে কোন ভাষার লেখ্য রূপ সেই ভাষায় প্রচলিত অক্ষরের উপর নির্ভরশীল বাংলা অক্ষর সংস্কারের বিষয়টি অনেকদিন থেকে আলোচিত হয়ে চলেছে, এই বিষয়ে একজন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অগ্রণী ব্যক্তি। তাঁর মতে স্বরান্ত ব্যঞ্জন একই ভাবে লেখা হবে, যেমন - কু, শু, প্রু, হু, শ্রূ, কৃ, হৃ। তবে যে যুক্তব্যঞ্জনের বিকৃত উচ্চারণ হয় তার আকৃতি তিনি একই রেখেছেন, যেমন - ক্ষ। তবে ব্যাকরণের সমর্থনে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করেছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় ছাপার সুবিধা অসুবিধার দিক না দেখে বর্ণের মূল রূপ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, বহুবছর পূর্বে বাংলা উড়িয়া গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় নাগরী অক্ষর চালানোর জন্য একলিপি-বিস্তার সমিতি গঠিত হয়েছিল। নাগরী-প্রচারিণী সভারও একই উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতিগুলি বর্তমানে নিষ্ক্রিয় হলেও শিক্ষিত বাঙালীর অনেকেই অক্ষর সংস্কারে উৎসাহী হয়ে অনেক পরিকল্পনার কথা প্রচার করেছেন।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলা অক্ষরের সংস্কার আবশ্যক এবং সেটা কি উপায়ে সুসাধ্য হবে এই বিষয়টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য। আতাতুর্ক তাঁর রাষ্ট্রে আরবী লিপির স্থানে রোমান লিপির প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন কারণ দেশের সুশিক্ষিত জনমতের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে সংস্কারের পরিকল্পনা সরল ও যুক্তি সম্মত নয়, আর সকল মানুষকে একসঙ্গে খুশী করাও যাবে না। তাই প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন যে, কিছু প্রতিষ্ঠাবান লেখক একমত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নূতন পদ্ধতি জেনে নেন এবং ছাপাখানার কর্তারা তাঁদের সাহায্য করলে তবে সংস্কার ক্রমশঃ সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যপরিষৎ, বিশ্বভারতীর অক্ষর সংস্কারে সমর্থন

পেলে সংস্কার দ্রুততর হবে।

'অক্ষরমালা'র আদর্শ সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যে অক্ষর চেনা পড়া লেখা সহজ যাতে জটিলতা নেই, যার গঠনে রেখার বাহুল্য নেই, যার মোট সংখ্যা অল্প, যোজনপদ্ধতি সরল এবং যার সঙ্গে বাংলা, ইংরেজী ও বিদেশী শব্দ ও মোটামুটি উচ্চারণে লেখা যায়, যা ছাপতে বিস্তর টাইপ দরকার হয় না, যার গড়নে ছাপতে সহজে টাইপ ভাঙে না বা টাইপরাইটারের উপযুক্ত।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলা লিপি সুশ্রী হলেও উপরে উল্লেখিত গুণের অভাব দেখা যায়। বাংলায় মূল বর্ণ ৪৮টি, ১৩/১৪ স্বরচিহ্ন, য-ফলা রেফ র-ফলা প্রভৃতি ৭/৮টি ব্যঞ্জন চিহ্ন এবং প্রায় ১৬০টি যুক্ত ব্যঞ্জন শিখতে হয়। ছাপাখানায় ইংরেজী ক্যাপিটাল, স্মল মিলিয়ে ৭০টি এবং বাংলায় ৫০০টি টাইপের প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, টাইপের ছাদ সূক্ষ্মবুদ্ধি শিল্পীর তৈরী নয়। সাধারণ মিস্ত্রী হাতের লেখার নকল করে নিজের রুচি্ অনুসারে একটু আধটু পরিবর্তন করে টাইপের ছাদ তৈরী করেছে, কিভাবে টাইপ সরল হবে সেদিকে কোন চিন্তা করা হয়নি। প্রাবন্ধিক বলেছেন বাংলা লিপির জায়গায় নাগরী লিপি চালালেও কোন লাভ হবে না কারণ এই লিপিও বাংলা লিপির মত দোষগ্রস্থ।

প্রাবন্ধিক 'লিপি'র ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, পাশ্চাত্য বা ভারতীয় কোন ভাষার বর্ণমালা মুদ্রাযন্ত্র বা টাইপরাইটারকে লক্ষ্য করে সৃষ্টি হয়নি শুধু লেখার সুবিধার জন্য গৃহিত হয়েছিল। ''বর্ণমালা ও তার লিখিত রূপ বা লিপি এক জিনিস নয়, প্রথমটি অবিকৃত রেখেও দ্বিতীয়টি বদলানো যেতে পারে।''[২] লিপি বা অক্ষরমালার আকৃতি কালে কালে বদলেগেছে যেমন - প্রাচীন সরল ব্রাহ্মী অক্ষর ক্রমে জটিল হয়ে বাংলা, নাগরী রূপ পেয়েছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, রোমান অক্ষর জটিলতাহীন বহুপ্রচলিত, বিন্যাসরীতি সরল তাই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান লিপির সুবিধা এবং কিভাবে তা বাংলা বর্ণমালায় প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে প্রাবন্ধিকের মতে বাঙালীর অভ্যাস মজ্জাগত, আত্মাভিমান প্রবল তাই উপযোগিতা থাকলেও রোমান অক্ষর প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই আমাদের যে লিপি আছে তাতেই সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত এবং বর্তমান রীতির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে ধীরে ধীরে এই সংস্কার করা উচিত।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, অনেকে যুক্তাক্ষরের স্থানে হাইফেন- যোগে অক্ষর সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। এই পদ্ধতিতে ছাপলে যোজিত অক্ষরের মধ্যে ফাঁকটি দৃষ্টি কটু হবে এবং অনেকে সংযোগচিহ্ন না ভেবে বিচ্ছেদচিহ্ন মনে করতে পারেন। যুক্তাক্ষরের বদলে হস্‌চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে এবং এই চিহ্ন নীচে না দিয়ে অক্ষরগুলির প্রায় মাঝামাঝি বসানো যেতে পারে। তবে সংস্কারের আরম্ভেই যুক্তাক্ষর তুলে দিয়ে হস্‌চিহ্ন চালানো কঠিন হবে।

প্রাবন্ধিক অক্ষর সংস্কারের বিষয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি দেখিয়েছেন -

(১) যুক্ত ব্যঞ্জনের স্থানে হস্‌চিহ্নের ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন - ধিক্‌কার, বাগ্‌দেবী, সদ্‌ভাব, প্রগল্‌ভ, সদব্যয়। কিন্তু উদ্যান, বিদ্বান, যথাবৎ লিখতে হবে। খণ্ড'ত' অনাবশ্যক। রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করলেও যুক্তব্যঞ্জন কমবে। নকশা, আড্ডা সরদার, পরদা, উলটা ইত্যাদি শব্দে যুক্তব্যঞ্জন বাদ দেওয়া যায় এবং হস্‌চিহ্ন ও না দিলে চলে।

(২) যুক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্গীভূত অক্ষরের অঙ্গীভূত মূল রূপ অবিকৃত থাকবে, যেমন - জ্ঞ, ক্ষ - এ বিষয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্রের রীতি গ্রহণীয়।

(৩) হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় বর্গীয় বর্ণের পূর্বে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণের

প্রতীকরূপে অনুস্বার দেওয়া হয় যেমন - 'রংগমংচ, পংডিত, নংদ, কংপ' তবে উচ্চারণ পঞ্চম বর্ণ অনুসারে হয়। আবার কয়েকজন বাঙালী ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার দিচ্ছেন যেমন - 'অংক, সংগে'। প্রাবন্ধিক আরও বলেছেন অনুস্বারের পুচ্ছ বাদ দিয়ে শুধু গোল চিহ্নটি পঞ্চম বর্ণের প্রতীকরূপে গণ্য হতে পারে। ফলে ২০টি যুক্তব্যঞ্জন কমবে ও নূতন পদ্ধতি অভ্যাসে অসুবিধা হবে না।

(৪) শব্দের আদি, মধ্য ও শেষে দেবার জন্য দুরকম এ-কার, আ-কার এবং ণ অনাবশ্যক। অনেক টাইপে - ব্যঞ্জনের সঙ্গে ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার, য-ফলা রেফ ও চন্দ্রবিন্দু জোড়া আছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সর্বত্র ই-কার, উ-কার, য-ফলা প্রভৃতি পাশে বসিয়ে দিলেই লাইনোটাইপের মত কাজ চলবে।

(৫) লাইনোটাইপে গ ণ দ ন প ম ল শ ষ স অক্ষরের ডান দিকের রেখাটি বাদ দিয়ে কতগুলি অর্ধ-টাইপ করা হয়েছে। এইগুলির পাশে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্ণ-টাইপ বসিয়ে দিলেই যুক্তাক্ষর তৈরী হয় যেমন- গ্ন, ন্ট দ্গ ন্দ ল্ক শ্চ স্ন ষ্ট। এইভাবে প্রায় ৭৬ টাইপ কমবে তাই সাধারণ টাইপেও এই পদ্ধতি গ্রহণীয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন অক্ষর সংস্কারের দ্বিতীয়ক্রমে অধিকাংশ যুক্তব্যঞ্জনের জায়গায় হস্‌চিহ্ন চালাতে হবে। য-ফলা, র-ফলা, রেফ, যেমন - ক্ল, ক্ষ, গ্ল, জ্ঞ, প্ল, ব্ল, ম্ল প্রভৃতি, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার প্রায় এগার বৎসর পূর্বে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন সবগুলি বাদ দিলে আমরা আদর্শ লিপিতে পৌঁছাতে পারব না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, মূল বর্ণগুলির আকৃতি সরল করে আ-কার ই-কার প্রভৃতির যোজ্য চিহ্ন যদি তুলে দেওয়া হয় তবে অক্ষরের আমূল পরিবর্তন হবে এবং স্বরব্যঞ্জন নির্বিশেষে সকল অক্ষর পাশাপাশি বসিয়ে শব্দরচনা যদি করা হয় তবেই সব বাধা দূর হবে।

অক্ষর সংস্কারের শেষ পর্যায়ের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আশা করেছেন - ''তত দিনে আমাদের স্বরাজ্যলাভ এবং আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে, উদ্যম বাড়বে, বুদ্ধি মোহমুক্ত হবে। তখন নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেরও চূড়ান্ত সংস্কার করতে দ্বিধাবোধ করব না।''[৩] রোমান লিপি সুপরিচিত তাই বাংলা বর্ণমালার লিখিত রূপ হিসেবে রোমান অক্ষর চালানো সুসাধ্য। 'ক' নাম দিয়ে K অক্ষর চালানো যেতে পারে। ইওরোপ যেমন সুবিধার জন্য ভারতীয় মঞ্চ এবং দশমিক গণনাপদ্ধতি নিয়েছে তেমনি প্রাবন্ধিক বলেছেন ''আমরাও সেইরকম রোমান লিপি আত্মসাৎ করতে পারি, তার জন্য দীনতার গ্লানি আমাদের স্পর্শ করবে না।''[৪]

ভাষার লেখ্যরূপের মাধ্যম অক্ষর। সেই অক্ষর বা লিপি যখন প্রথম প্রচলিত হয়েছিল তখন তা শুধু হাতে লেখার উদ্দেশ্যে প্রচলিত হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তাই যে গ্রন্থ শুধু হাতের লেখনীর মাধ্যমে প্রচারিত হত আজ সেখানে ছাপাখানায় লাইনো টাইপের মাধ্যমে ছাপা হতে আরম্ভ হল এবং এখানেই প্রথম বাংলা অক্ষরের আকার ও বিস্তৃতি সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তি অক্ষর সংস্কার নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন। এই প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক অক্ষর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে লাইনো-টাইপে প্রয়োগ করার জন্য কিভাবে বাঙালী জাতির মানসিকতা অভ্যাস ও আত্মাভিমান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা লেখকের সন্ধানীদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। প্রাবন্ধিক অক্ষর সংস্কারের জন্য কয়েকটি পথ নির্দেশ করেছেন এবং রোমান লিপি গ্রহণ করলেও আমাদের অমর্যাদা যে হবে না সেকথাও বলেছেন - এখানে লেখকের উদারতা ও টাইপ উপযোগি করার জন্য পরামর্শ পাই যা আমাদেরকে অক্ষর সংস্কারের বিষয়ে সচেতন করে।

বাংলা বানান (১৯৪৪)

বুদ্ধদেব বসু রাজশেখর বসুকে বাংলা বানান সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন। এবং এই চিঠিতে উত্থাপিত এবং অনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে এই প্রবন্ধ লেখক রচনা করেছেন।

সাত-আট বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার সমিতির প্রস্তাব শিক্ষিতজনের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল, কেউ রাগ দেখিয়েছিলেন আবার কারো মতে সংস্কার আরও বেশি করা উচিত ছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল - যে বানানের মধ্যে ঐক্য নেই সেগুলি সম্ভবত নির্ধারণ করা এবং বাধা না থাকলে স্থলবিশেষে বানান সংস্কার করা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে দুটি নিয়ম - রেফের পর দ্বিত্ববর্জন (কর্ম, কার্য), ক-বর্গ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে ং-এর প্রয়োগ করা (ভয়ংকর, সংগীত, সংঘ) - এইগুলি ব্যাকরণসম্মত বিধি। অসংস্কৃত বা তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দের জন্য কতগুলি বিধি দেওয়া হলেও বানানে পরিবর্তন করা হয়নি কারণ সমিতির মতে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্তন হওয়া উচিত। বানান-সমিতি যে বিষয়ে কিছু বলেননি বা বিধান দেন নি - এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বাংলা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার বানানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুভাষার বানান শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে পরিণতি পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সবাই তাদেরকে অনুসরণ করেছিলেন তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন সাধু ভাষার বানান সুনির্দিষ্ট হতে পেরেছে কিন্তু চলিত ভাষার প্রকাশশক্তি দেখে লেখকরা আকৃষ্ট হলেও নূতন পদ্ধতি আয়ত্ব করার জন্য যত্ন নিলেন না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক চলিত ভাষা শেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় চলিত ভাষার বানানে অনেক বিশৃঙ্খলা থেকে গেল।

চলিতভাষা এবং কলকাতার মৌখিক ভাষার মধ্যে মিল থাকলেও এই দুই ভাষা সমান নয়। মানুষ যতটা সতর্ক হয়ে লিখে, কথা বলতে ততটা সতর্ক হয় না, প্রাবন্ধিক বলেছেন - ''একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান।''[৫] তাই চলিত ভাষাকে সাধুভাষার মত stadardized হতে হবে। লেখা বা সাহিত্যের ভাষা পড়ে বুঝতে হয় - তাই এই ভাষা সার্বজনীন, চেহারাটা আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হলেও ক্ষতি নেই তাই চলিত ভাষার বানানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

অনেকের মতে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন, কার্যত তা অসম্ভব, যেমন পশ্চিমবঙ্গে 'মিচে কথা' (মিছে কথা) তেমনি পূর্ববঙ্গে 'তারাতারি' (তাড়াতাড়ি) ইত্যাদি। ''যে অল্পসংখ্যক লেখকদের চেষ্টায় চলিতভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রথম চৌধুরী ইত্যাদি, তাঁদের প্রভাব অবশ্য কিছু বেশী। আদি লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবও নগণ্য নয়।''[৬] চলিতভাষা একটি synthetic বা কৃত্রিম ভাষা তাই এই রীতির বানান সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, উচ্চারণের বিষয়টা পাঠকের অভ্যাস ও রুচির উপর ছেড়ে দিলেই চলবে।

সাধুভাষায় লেখা হয় 'করিতেছে, বসিবে' চলিত ভাষায় হবে - করছে, বসবে। হস্‌চিহ্নের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন বাংলা অক্ষর সরল করার জন্য যুক্তব্যঞ্জন তুলে দিলে হস্‌চিহ্নের বহুপ্রয়োগ প্রয়োজন হবে।

ও-কারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন, আজো, আরো না লিখে 'আজ-ও, আর-ও লিখা উচিত কারণ 'ও' প্রত্যয় নয় একটি অব্যয়শব্দ অর্থ হল - অপি, অধিকন্তু, also, even তাই অব্যয় শব্দের নিজের রূপ নষ্ট করা ঠিক নয় এবং ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নেই।

'কারুর' - শব্দটিকে প্রাবন্ধিক slang বলেছেন, সাধুভাষায় 'কাহারও' থেকে চলিত 'কারও' কথার টানে 'কারু' হতে পারে কিন্তু আরেকটি 'র' যোগ - এর প্রয়োজন নেই।

'য়' অক্ষরের দুরকম প্রয়োগ - 'হয়, দয়া' এখানে y-এর মত আদিম উচ্চারণ বজায় আছে কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' এখানে 'য়' স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র কারণ এই বানান 'হালুআ বা খাওআ' করলেও কোন ক্ষতি হয় না। তাই য়, য়া, য়ে স্থানে প্রাবন্ধিক বলেছেন অ, আ, এ লিখলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না কারণ উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

সংস্কৃত শব্দে অনুমানিক বর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তা থেকে বাংলা শব্দে চন্দ্রবিন্দু আসে - যেমন - হংস, পঙ্ক, পঞ্চ, কন্টক, চন্দ্র, চম্পা থেকে 'হাঁস, পাঁক, পাঁচ, কাঁটা, চাঁদ, চাঁপা। কয়েকটি শব্দে অকারণে ও চন্দ্রবিন্দু হয় যেমন - পেচক, চোচ থেকে পেঁচা, চোঁচ। অনেক অজ্ঞাতমূল শব্দেও চন্দ্রবিন্দু আছে, যথা- কাঁচা, গোঁজা, ঝাঁটা। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়, পূর্ববঙ্গীরা অনুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নয় তাই অনেক সময় যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দু না দিয়ে অস্থানে দিয়ে দেন। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন যে বিভিন্ন জেলার কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি একত্র হয়ে চন্দ্রবিন্দু এবং ড় সম্বন্ধে একটি বানানের তালিকা প্রস্তুত করে দেন তবে সহজে বানান নিরূপিত হবে।

সমস্ত প্রবন্ধের মূল বিষয়কে প্রাবন্ধিক 'মোট কথা' বলে শেষে একত্রিত করেছেন -

(১) অসংস্কৃত শব্দের বানান পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনের উচ্চারণের মত করতে হবে এবং 'এক্ষেত্রেও অনেক জায়গায় মীমাংসার প্রয়োজন আছে।

(২) বানানে অতিরিক্ত অক্ষরযোগে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বাড়ে।

(৩) সর্বত্র উচ্চারণের নকলের প্রয়োজন নেই, পাঠ প্রকরণ বা context থেকে উচ্চারণ বোঝা যায়।

(৪) সাধুভাষায় বানান কালক্রমে অনেকটা সংযত হয়েছে কিন্তু মৌখিক ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় চলতি ভাষায় তা সহজে হবে না তাই লেখকদের উদ্‌যোগী হয়ে সমবেত ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

ক) সাধুভাষা শিক্ষিত সুচিন্তিত গোষ্ঠীর সৃষ্টি, চলিত ভাষা সময়ের প্রয়োজনে তড়িঘড়ি জনাকয়েক মনীষির হাতে গড়া তাই চলিত ভাষার বানান রীতি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সৃষ্টি হয় নি।

খ) পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার কাছাকাছি হওয়ায় তার বানানের সাতন্ত্র্য রক্ষায় অসুবিধা হয়।

'বাংলা বানান' প্রবন্ধটি বানান সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর চিঠির উত্তর রাজশেখর বসু দিয়েছেন। এখানে সাধু ও চলিত ভাষার বানান কতটা উচ্চারণের ভিত্তিতে হবে তা আলোচনা করে বলেছেন যে সাধুভাষা অনেক কাল ধরে সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই তার একটা নির্দিষ্ট রূপ এসে গেছে। কিন্তু চলিত ভাষা নূতন, এ নিয়ে বর্তমানে পরীক্ষা চলছে তাই তার বানান স্থির করতে হবে এবং সেখানে উচ্চারণের দিকে না তাকিয়ে একটা সাধারণ নিয়ম নিদিষ্ট করতে হবে এবং তাতে বানান সহজ করার দিকেই প্রাবন্ধিক মত দিয়েছেন। যা বর্তমান কালে বাংলা বানান সংস্কারে ভিন্ন জনের প্রচেষ্ঠার মূল বিষয় যে বানান সহজ করার প্রবণতা এই দিকটি বিশেষ করে চোখে পড়ে।

বানানের সমতা ও সরলতা (১৯৫৭)

এই প্রবন্ধের প্রথমে একটি ঘটনাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশীয় লেখক এবং বাঙালী অধ্যাপক কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাতীয় সংগীতে হিন্দী বানানে

'দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গা, উচ্ছল-জলধিতরঙ্গা' - এই অনর্থক আ-কার যোগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিতজীর উত্তর - বাংলা অ-কার যেমন awe কিন্তু হিন্দীতে তেমন নয় up-এর আদ্যক্ষর তুল্য হ্রস্ব। হিন্দীতে হ্রস্ব অ-কার টেনে দীর্ঘ করার জন্য অ-কারান্ত বঙ্গ হিন্দী উচ্চারণে 'বঙ্গা' হয়ে যায়। তাছাড়া হিন্দী বানানে আ-কার না দিলে লোকে পড়বে - 'দ্রাবিড়্ উৎকল্ বঙ্গ্ উচ্ছল্ জল্ধিতরঙ্গ্। তুলসীদাসজীও 'রামায়ণ' রচনায় ছন্দের প্রয়োজনে অ-স্থানে আ-করেছেন যথা - 'সুনি প্রভু বচন হরস হনুমানা, শরণগত বচ্ছল ভগবানা।" তাছাড়া তাঁর মতে বাংলা বানানেও অনেক ভুল আছে।

প্রাবন্ধিক এখানে বাঙলা, আসামী, ওড়িয়ী, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি আর্যভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে এবং যত বেশি এই মিল থাকবে ততই মঙ্গল বলেছেন। বাঙলা বানানে অনর্থক বৈষম্য বাংলা সাহিত্যের অবাঙালী পাঠকের পক্ষে লাভজনক হবে না বলে মনে করেন।

সংস্কৃত 'অ' কণ্ঠ্য বর্ণ, উচ্চারণ up-এর আদ্যক্ষর তুল্য। মূলতঃ ই, ঈ, অ, আ - এইগুলি একই ধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ। বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি শব্দে একই বানান (চলত) এবং স্থানভেদে বাংলায় অ-কারের চার রকম উচ্চারণ ছিল - কটা, কটু, একটু, টি-কপ। কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন, আধুনিক বাংলায় হ্রস্ব উচ্চারণ হ্রস্ব উচ্চারণ না হয়ে অ-কার স্থানে আ-কারের ব্যবহার চলছে - ক্লাব, বাস, সার্কাস, কাটলেট।

হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটীতে অ-কারের বিবৃত বা হ্রস্ব, গ্রস্ত বা হসন্তবৎ উচ্চারণ দেখা যায়। যেমন - 'কল বন বট' হিন্দী উচ্চারণ eull, bun, but-এর মত। গ্রস্ত অ-কার হিন্দীতে বেশী দেখা যায় যেমন বাংলা 'জনতা, বিমলা, কামনা' - হিন্দী উচ্চারণ 'জন্তা, বিম্লা, কাম্না'। তবে হিন্দী সংবৃত awe - তুল্য অ-কার নেই তাই সেখানে আ-কার লেখা

হয় যেমন - royal রায়ল, talky-টাফি -। পূর্বে বাঙালীরা তেমনি বানান করত যেমন - আগষ্ট, কালেজ, লাট ইত্যাদি।

প্রাবন্ধিক বলেছেন অ-কারের শক্তি ফিরিয়ে আনা উচিত। কারণ হ্রস্ব অ-স্থানে আ-কারের প্রয়োগ খুব বেশিদিনের নয় উদাহরণ রূপে ১৮৬৫ সালের প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যাপত্রে আছে - 'অপর সরকিউলর রোড' রবীন্দ্রনাথের পুরণো গ্রন্থেও 'কটলেট, থর্ড' ইত্যাদি বানান পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক লেখকদের কাছে আগ্রহ জানিয়েছেন যে তাঁরা একটু চেষ্টা করলে অ-কারের মৌলিক বিবৃত হ্রস্ব উচ্চারণ ফিরাতে পারবেন। স্থানভেদে অ-কারের চার রকম বাংলা উচ্চারণ হতে পারে অবাঙালী পাঠকের উচ্চারণে ভুল হলেও অর্থবোধে বাধা থাকবে না। তাই হিন্দী বানানে কি লিখছে তা দেখা আমাদের প্রয়োজন নেই কারণ প্রাবন্ধিক বলেছেন আমরাও হিন্দী হৈ স্থানে হ্যায় লিখে থাকি।

বানান-সমিতির আর একটি নিয়ম যে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে ৎ স্থানে স এবং sh স্থানে 'শ ব্যবহৃত হবে, যেমন - ইশারা, তামাশা, শয়তান-এ তালব্য শ, কিন্তু আসমান, জিনিস সাদা - ইত্যাদিতে 'স' ব্যবহৃত হবে। হিন্দী বানানে এই রীতি মানা হয় - সকলে এই নিয়মে বানান করলে সামঞ্জস্য আসবে।

প্রাবন্ধিক অনর্থক শব্দে apostrophe বা উর্ধ্ব কমা সম্বন্ধে বলেছেন কারণ এই কমা উচ্চারণে কোন পরিবর্তন আনে না তাই এর প্রয়োজনীতা প্রায় নেই।

অনেকে বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য শেষে হস্‌চিহ্ন দেন যেমন - কাট্‌লেট্‌, টি-পট্‌, প্লেট, ডিশ্‌ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন হস্‌চিহ্ন না দিলে বিশেষ ক্ষতি নেই কারণ হস্‌চিহ্ন ছাড়া লিখলেও উচ্চারণে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন - এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা যায় না

তাই কাছাকাছি বানান হলেই যথেষ্ট। তাই মেইন, চেইন - এইভাবে লিখলে মানুষ অনর্থক ই-কারের উপর জোর দেয় তাই অনেক সময় ভয়ংকর উচ্চারণ হতেও দেখা যায়, তাই এই বিষয়েও সচেতন হওয়া আবশ্যক।

হিন্দী ও বাংলা দুটি ভাষার মধ্যে উচ্চারণ পার্থক্য আছে। তাই বানানে পরিবর্তন করে উচ্চারণে সমতা আনার চেষ্টা করা বৃথা কারণ এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা ঠিক সম্ভব নয়।

বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৩৫)

১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের রীতি নির্দিষ্ট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে এক সংস্কার সমিতি গঠন করেন। এতে সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু, তাছাড়া প্রথমনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সমিতির নির্ধারিত বানানের নিয়মাবলীর সমর্থন করেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ইংরেজীতে নিজস্ব মত দিয়েছেন।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত এজন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অধিক পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। সুপ্রচলিত শব্দের বানান সংস্কারে বানানের জটিলতা না বাড়িয়ে সরলতা সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দের সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক এবং এই বানানের

নিয়ম সরল করে গঠন করা উচিত। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ যা বাংলায় গৃহিত হয়েছে সেই শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হয়েছে তাই তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এককালে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব নয় তা ধীরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে কতগুলি বানানের নিয়ম দেওয়া হয়েছে, এই নিয়মগুলি অনেক সময় শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হতে পারে। কেবল নিয়মের বন্ধনে বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ সম্ভব নয়। তাছাড়া পদ্য রচনায় সবক্ষেত্রে এই নিয়ম রক্ষা করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। তথাপি বানানের নিয়ম বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশিষ্ট লেখকদের রীতি অনুসারে ই ঈ উ ঈ জ ও-কার ং ঙ শ ষ স প্রভৃতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম গঠিত হয়েছে।

বাংলা তদ্‌ভব শব্দে মূলানুসারে 'ণ' প্রয়োগ দেখা যায়, যথা - কাণ, সোণা। আবার কোথাও বামুন, গিন্নী। বাংলা ক্রিয়াপদে ণত্ব হয় না যথা - শোনা, করেন, করুন। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখে থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে প্রচলিত হচ্ছে। তেমনি 'কোরাণ, গভর্ণর' প্রভৃতিতে ণত্ব করার কোন হেতু নেই। অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করলে বানান সরল হবে।

<u>সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ -</u>

১। রেফের পর বঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব -

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হবে না, যথা - অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব। - এতে লেখা ও ছাপা সরল হয়।

২। সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার -

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা 'ঙ' বসে থাকে যথা - অহংকার, ভয়ংকর অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থিত 'ম্' স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা - সংজাত, স্বয়ংভু অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভু'। বাংলায় এই নিয়মে সর্বত্র 'ং' দিলে উচ্চারণে বাধতে পারে, তবে ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করলে বাধবে না বরং বানান সহজ হবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ -

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না যথা - কর্জ, শর্ত, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি।

৪। হস্‌চিহ্ন - শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন দেওয়া হবে না যথা - ওস্তাদ, কংগ্রেস, ট্রাম, ডিশ, পকেট, করিলেন, করিস। তবে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্‌চিহ্ন দেওয়া উচিত। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা - দহ, অহরহ, ফাণ্ড, পঞ্জ। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্‌চিহ্ন আবশ্যক যথা - শাহ্, তখত্, জেমস্, বণ্ড,। তবে সুপ্রচলিত শব্দে হস্ না দিলে ও চলে যেমন - আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন - অনুসারে হস চিহ্ন দেওয়া হয়, যথা - 'উল্‌কি, সট্‌কা'। উপান্ত স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হলে হস্ চিহ্নে বিধেয় যথা - কট্‌কট্, খপ্, সার্'। কেবল মাত্র ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্‌চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ -

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব শব্দে ঈ ঊ বা ই উ ব্যবহৃত হয় যথা - কুমীর, পাখী, বাড়ী, ঊনিশ, চূন, পূব, অথবা, কুমির পাখি, বাড়ি, উনিশ চুন, পুব। কিন্তু কতগুলি শব্দে ঈ, ই, উ হবে, যথা - নীলা (নীলক) হীরা (হীরক) পানি (পানীয়), চুল (চূল), জুয়া (দ্যূত)।

স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে, যথা - কলুনী, বাঘিনী, কেরাণী, কাবুলী, ইংরেজী, রেশমী। কিন্তু কতগুলি শব্দে 'ই' হবে যথা - ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি। পিসী, মাসী তে পিসি, মাসিও লেখা যায়।

মনুষ্যেতর জীব, বস্তু , গুণ, ভাব, কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা - বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, সরাসরি, সোজাসুজি, কেরামতি, তাড়াতাড়ি।

৬। জ, য -

'য' না লিখে 'জ' লেখা বিধেয় - কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। ণ, ন -

অসংস্কৃত শব্দে শুধু 'ন' হবে, যথা - কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ন্ট, ণ্ড, ণ্ঠ, ণ্ঢ যথা - ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা। রানী স্থানে 'রাণী - ও হতে পারে।

৮। ও-কার ও উর্ধ্ব কমা প্রভৃতি

যদি অর্থগ্রহণে বিশেষ বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে উর্ধ্ব - কমা বিকল্পে দেওয়া যেতে পারে যথা - কাল, কালো, ভাল, ভালো, পড়ো প'ড়ো।

৯। বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, বাঙ্গালী উভয় বানান চলতে পারে। হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা - বরং, রঙ, সং, সঙ। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা - রঙের, বাঙালী, ভাঙন।

ং ঙ - এর প্রাচীন উচ্চারণ অন্য হলেও আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান তাই ং স্থানে ঙ লেখা যায়।

১০। শ ষ স

তদ্ভব শব্দে শ, ষ, স হবে, যথা - আঁশ, (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা) তবে কতগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হয়, যথা মিনসে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণে ৎ স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা - আসন, ক্লাব, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্স্পিয়র। কিন্তু ব্যতিক্রমও দেখা যায় - ইস্তাহার, (ইশতিহার) গোমস্তা (গুমাশ্তাহ) ভিস্তি (বিহিশ্তী) খ্রীষ্ট (christ)।

শ ষ স - এই তিন বর্ণের দুটি বা একটি বর্জন করলে বাংলা বানান সরল হয় কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে তিনটি শ ষ স - এর প্রয়োগ দেখা যায় এবং

একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। তাই এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের বানানেও শ, স লেখা হয়। আবার ব্যতিক্রমও দেখা যায় যথা - সরবৎ, শরবৎ, শরম, সরম, শহর, সহর, শয়তান, সয়তান, পুলিস, পুলিশ। এখানে সামঞ্জসের জন্য একই নিয়ম বাঞ্ছনীয়।

বিদেশী শব্দের ৎ-ধ্বনির জন্য বাংলায় 'ছ' অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু প্রচলিত বানান ঠিক থাকবে যথা - কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ। দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান থাকবে যথা - করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ) উদাহরণ (উশখুশ)।

১১। ক্রিয়াপদ -

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে করান, পাঠান, প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের উদাহরণ দেওয়া হল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব কমা বর্জন করা যেতে পারে এবং নাম বিভক্তি স্থানে-লুম বা লেম লেখা যেতে পারে।

<u>হ-ধাতু</u>

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

<u>খা-ধাতু</u>

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে,

খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো। খাস। খেতে, খেএয়, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই, শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোব), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্।

লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে, লিখো, লিকসি। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখভার, লেখা।

উঠ্ ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, খরান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ ঃ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর - প্রভৃতি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তার সাধু রূপ চলিত ভাষায় গ্রহণীয় - যথা - পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা - কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ -

Cut-এর u cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই নবাগত বিদেশী শব্দের বানান রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি

বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যে সব বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও প্রচলিত বানান তাই বজায় থাকবে, যথা- 'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

১৩। বিকৃত 'অ' (cut এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে, তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয় যথা - ক্লাব (club), বাস (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget) ইত্যাদি।

১৪। বক্র অ বা বিকৃত এ cat-এর a

মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে '্যা বিধেয়, যথা - অ্যাসিড (acid) হ্যাট (hat)। এই উচ্চারণের বানানে বাংলায় অ্যা হতে পারে।

১৫। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা - সীল (seal) ঈস্ট (east) ঊস্টার (worester) স্পূল (spool).

১৬। f v

এইগুলি যথাক্রমে ফ ঙ; যথা - ফুট (foot), ভোট (vote), যদি মূল শব্দে V-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে যথা - ফন (von).

১৭। W

W স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয় যথা - উইলসন (Wilson) উড (wood), ওয়ে way)।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার প্রভৃতি। এতে 'য়' লিখলে উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার বণ্ড' না লিখে এড্ওয়ার্ড, ও অরবণ্ড লেখা উচিত। হার্ডওয়ার (hardware) বানানে দোষ নেই।

১৯। S, Sh

২০। St

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা - স্টোভ (stove) ।

২১। Z

Z স্থানে জ বা জ্ বিধেয়।

২২। হস্ চিহ্ন

বাংলা বানানের নিয়ম প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম নির্দিষ্ট করেছিলেন সেগুলির কথা এখানে যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সমস্ত আলোচনায় সরস সাহিত্যবোধের তীক্ষ্ন বৈজ্ঞানিক মেধার সংযোগে ব্যাকরণের বিষয় ও সরস ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ (১৯৪০)

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, জামসেদপুরের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুস্থির কুমার বসুকে লেখা রাজশেখর বসুর একটি চিঠি। সুস্থির কুমার বসু 'বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক রূপকে সর্বমান্য করার উপায় ও অভিমত সম্বন্ধে রাজশেখর বসুকে চিঠি লিখেছিলেন,

তারই উত্তর এ চিঠি। আধুনিক সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, সে বিষয় মূলত এখানে আলোচিত হবে। ভাষার তিন অঙ্গ

(১) লিপি বা বর্ণমালার আকৃতি।

(২) শব্দাবলীর প্রকার বা form

(৩) বানান।

প্রাবন্ধিক প্রথমেই মৌখিক, লৈখিক, সাধু ও চলিত - এই বিষয়গুলির সংজ্ঞার অর্থ বিশদ করেছেন। মৌখিক ভাষা যেমনই হোক লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা হবে - যা সর্বসম্মত যা দিয়ে বাঙালীর সঙ্গে সাহিত্য বা সহযোগ হয় অর্থাৎ যা সাহিত্যের উপযুক্ত। মৌখিক ভাষা উচ্চারণ সর্বস্ব - মৌখিক ধ্বনির মাধ্যমে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারি। কিন্তু লৈখিক ভাষার চেহারা আসল, তা সর্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা তাই বানানে অবশ্যই মিল থাকা দরকার।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে 'সাধু' ও 'চলিত' দুটি রূঢ় শব্দ, দুইভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। এই দুই ভাষার প্রধান প্রভেদ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য যথা - 'তাঁহারা বলিলেন' কিংবা 'তাঁরা বললেন' কতগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের জন্য যথা - উঠান, একচেটিয়া, মিছা, সুতা কিংবা উঠন, একচেটে, মিছে, সুতো তাছাড়া লেখকের ভঙ্গীগত প্রভেদ দেখা যায় কেউ বা বেশী সংস্কৃত শব্দ ও সমাস কেউ বা বেশী আরবী ফারসী শব্দ আবার কেউবা পদবিন্যাসে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের চেষ্টা করেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন এই সকল ভঙ্গী সাধু বা চলিত ভাষার বিশেষক লক্ষণ নয়।

চলিত ভাষা ও পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা একই এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সাদৃশ্য এই যে চলিত ভাষার সর্বনাম ক্রিয়াপদ প্রভৃতি কতগুলি

শব্দের বানান ভাগীরথীতীরস্থ কয়েকটি জেলার মৌখিক ভাষার শিষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। তবে ঐ জেলাবাসী চলিত ভাষায় লিখলে মুখের ভাষায় 'গ্যালো রোববারে কোথা গেশলে হে?' কিন্তু লেখেন - 'গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে'। লেখার সময় লোক সাবধান হলেও কথাবার্তায় ততটা হতে পারে না।

সাধু চলিত যাই হোক - সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার সমান হতে পারে না। তবে এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে লৈখিক ভাষা গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে তার মধ্যে পরিবর্তনও দেখা যায়। যেমন - রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের' তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। সাধুভাষাতে 'তাদের' লেখা হয়। লিখা, শিখা, শুনা, ঘরা, লতানিয়া, জালুয়া, হয়েন, যায়েন স্থানে এখনও সাধুভাষাতে 'লেখা, শেখা, শোনা ঘোরা, লতানে, জলো, হন, যান' চলছে। এই পরিবর্তন জীবন্ত ভাষার লক্ষণ এবং তা অজ্ঞাতসারে হয়ে চলেছে।

কলিকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলন ক্ষেত্র তাই লৈখিক ভাষা হিসেবে পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষার যোগ্যতা বেশী। তবে উচ্চারণ ও বানানের সংগতি রক্ষা সর্বত্র সম্ভব নয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সাধু ও চলিত দুইরকম ভাষার পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই কারণ দুই-এর সমন্বয় অসম্ভব নয়। এমন লৈখিক ভাষার প্রয়োজন যাতে বর্তমান সাধুভাষা ও মার্জিতজনের মৌখিক ভাষা দুই-এর সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের জন্য যে বাক্‌সংকোচ তা চাই আবার মৌখিক ভাষার প্রকাশ শক্তি ও প্রয়োজন।

ভাষার তৃতীয় অঙ্গ বানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বানানরীতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

অনেকে বলেন বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি জানা থাকা দরকার। প্রাবন্ধিক বলেছেন, ব্যুৎপত্তি না জেনে ও 'উজ্জ্বল' এ ব-ফলা বসানো হয় কিন্তু কজ্জল এ দেওয়া হয় না। তাই এই জ্ঞান সাধারণ ধীরে-ধীরে শিখবে। শব্দগঠন এবং বানান বিধির বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি ঋদ্ধ।

বাংলা ভাষার গতি (১৯৫৩)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলা ভাষার বয়স অনেক হলেও এই ভাষার যৌবনারম্ভ মাত্র দেড়'শ বছর আগে হয়েছিল। কারণ এর পূর্বে সাহিত্য ছিল পদ্যময় এতে নবরসের প্রকাশ হলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হত না। প্রাবন্ধিকের মতে গদ্য ছাড়া পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতী ইতিহাসে এলিজাবেথীয় ভিক্টরীয় ইত্যাদি যুগ দেখা যায় তেমনি বাংলা সাহিত্যেও ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র যুগ আছে। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই সেই বিশেষ লেখকের যুগ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সাহিত্যিকরা প্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথের উদার শাসন কোন রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনে ভাষার যে বহিরঙ্গ ও আকৃতিগত অবস্থা তা নিয়েই প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

চলিত ভাষার প্রসার

প্রাবন্ধিক বলেছেন 'হুতোম পেঁচার নকশা' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থকে অনেকে চলিত ভাষায় লেখা বলেছেন তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন বইগুলিতে প্রচুর গ্রাম্য ও

ফরাসী শব্দ থাকলেও সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ দেখা যায়।

বঙ্কিমযুগের গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বলত। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্র পাত্রীদের মুখে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও নিজের বক্তব্য তাঁরা সাধুভাষাতেই লিখতেন। পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা লিখেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তা এখন চলিত ভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যান্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

প্রাবন্ধিক লেখকদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে চলিত ভাষা কলকাতা বা অন্য কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয় তা সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভুত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। তাই এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ তৈরি করতে হবে।

বানানের অসাম্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম রচনা করেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র স্বাক্ষর করে তাদের সম্মতি জানিয়েছিলেন। এরপর রবীন্দ্র রচনাবলীতে বানানের এই নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু লেখক এই নিয়ম মানছেন অধিকাংশ লেখক নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে নিজের মত চলছেন। এর কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন - ‘‘বাঙালীর নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালী ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।’’[৭]

তাই বাংলা বানানে সামঞ্জস্য হতে দেরী হবে। অ্যা য়্যা এ্যা প্রভৃতি বানানে থাকবে, ও-কার, হস্-চিহ্ন, য-ফলা প্রভৃতি অনর্থক ব্যবহার বাংলা বানানে চলবে। এইভাবে বানান

ব্যবহার হতে হতে কতগুলি বানান বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়ীত্ব পাবে অন্যগুলি লোপ পাবে।

পূর্ববঙ্গের প্রভাব

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সাধুভাষা যখন সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন লেখক কোন জেলার লোক তা লেখনী দেখে অনুমান করা যেত না। কিন্তু বর্তমানের চলিত ভাষার লেখা সাহিত্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ছাপ দেখা যায়। 'আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি (কেমন যেন) সুন্দর মতো' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু প্রয়োগ অশুদ্ধ নয় তাই বর্জনীয় বলা যায় না। অকারণে ঐ নাকি' অচেতন পদার্থে 'রা' যোগ করেন, যেমন - 'আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে। কর্মকারকে অনর্থক 'কে' বিভক্তির ব্যবহার যথা 'বইগুলিকে গুছিয়ে রাখ'। তাছাড়া, 'দেওয়া, নেওয়া, সওয়া', স্থানে 'দেয়া, নেয়া, সোয়া' লেখেন মমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন - এইভাবে পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় ঢুকে যাচ্ছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক চলিত ভাষার সাদৃশ্য বেশী। তাই লেখকরা প্রাদেশিক সংস্কার ভুলে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করলে ভাল হয়, এখানে কোন জেলার গৌরব বা হীন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অজ্ঞতার জন্য পূর্ববঙ্গবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাবাসীরা অস্থানে চন্দ্রবিন্দু, যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, 'ড়' এবং 'র' এর বিপর্যয় দেখা যায়। কথা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধির বন্ধুর চিঠির উল্লেখ করেছেন - 'ঘাঁড়েঁ ফোঁড়া হওয়ার বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র মহাশয় এই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঘাড় আর ফোড়ার চন্দ্রবিন্দু দেখে তিনি এথেকে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছেন। অনেকে আবার 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ'

লেখেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন - এরূপ লেখার জন্য অনেকে যুক্তি দিয়েছেন যেন 'চেন' লিখলে 'চ্যান' পড়ার আশঙ্কার জন্য 'ই' দেওয়া দরকার। প্রাবন্ধিকের যুক্তি অন্য ভাষার বানান উচ্চারণের কাছাকাছি হলেই চলে তাকে যথাযথ প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না কিন্তু প্রাবন্ধিক বলেছেন, লেখার সময় সতর্ক হয়ে প্রামাণিক বানান অনুসরণ করা উচিত।

শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

প্রাবন্ধিক বলেছেন, একালে লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন কোন জীবিত ভাষা নির্দিষ্ট ব্যাকরণের নিয়ম পুরোপুরি না মেনে স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে তাই কালে সেই ভাষার ব্যাকরণ, শব্দাবলী, শব্দার্থ, বাক্যরচনার রীতি বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং সংস্কৃত লাটিন গ্রীক ভাষার মত মৃত ভাষাও নয়।

''অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয়।''[৮]

আসামী, ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী ভাষাও সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার, শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে প্রাবন্ধিক বলেছেন বাংলা ভাষার ক্ষতি হবে। ভারতের অধিকাংশ ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের বানান ও অর্থ বিকৃত করলে মূল যোগসূত্র ছিন্ন হবে এবং অন্য প্রদেশবাসীর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বুঝতে অসুবিধা হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ কেউ করেন না তবে পণ্ডিতের ও ভুল হতে পারে, প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে একে আর্ষপ্রয়োগ বলা হয়, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না।

কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল, স্থানে 'ধূম্রজাল' 'শয়িত বা শয়ান স্থানে শায়িত, 'প্রসার স্থানে প্রসারতা' 'কৌশল' বা পদ্ধতি অর্থে 'অঙ্গিক' প্রামাণিক' অর্থে প্রামাণ্য, ক্ষীণ বা মিচমিচে অথে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় দেখা যায়। প্রাবন্ধিক বলেছেন, শুদ্ধ শব্দ লিখলে মিষ্টত্বের হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য যে সতর্কতা আবশ্যক তা অনেকেই মেনে নেন না।

ইংরেজীর প্রভাব

'প্রাবন্ধিক বলেছেন ইংরেজী অতি সমৃদ্ধ ভাষা। ইংরেজী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ ভুল কিছু নয় কিন্তু বাংলা ভাষায় আছে যে শব্দ তাকে অবহেলা করে বিদেশী শব্দ বা বাক্যের নকল করলে মাতৃভাষার দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং বিকৃত হবে। Medium এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম' - যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। ইংরেজী বাক্যের অনুকরণে অনেকে লেখেন - 'বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা' প্রাবন্ধিক বলেছেন 'বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা' নিলেই চলে। তেমনি 'এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্বের সমাগম হয়েছিল'? এখানে ইংরেজী Personality-র আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলেই চলত। Promise, signature-এর বিশেষ অর্থ প্রতিশ্রুতি, স্বাক্ষর-এর অপপ্রয়োগ দেখা যায় -। ''নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন'। 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' 'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না''[৯] - এরূপ অন্ধ অনুকরণ করলে বাংলা ভাষা উৎকট সংকর ভাষায় পরিণত হবে।

উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

প্রাবন্ধিক বলেছেন, নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজী বইএ লিখেছেন - বাঙালী বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এইকথা লিখবে - রুদ্র তার প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। আগুন লাগা 'বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা' জলে ডুবাকে 'সলিল সমাধি' ব্যর্থ লিখতে 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল'। সরল ভাষায় বক্তব্য অনেকেই লিখতে পারেন না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনায় উচ্ছ্বাসিত ভাষা 'অনর্থকর'। ..... যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে।''[১০] তাই স্কুল কলেজের জন্য রচিত বিজ্ঞান বই বাগাড়ম্বর শূন্য হওয়া উচিত।

মৌখিক ও লৈখিক ভাষার পার্থক্যের সম্বন্ধে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস একাধিক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। যখন সাধু ও চলিত উভয়ই লৈখিক ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তখন ব্যাকরণ বিধি বানান রীতি ইত্যাদির দিকে অবশ্যই প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সাধু বা চলিত যে কোন ভাষা রীতিতে লেখা যেতে পারে।

সাহিত্য জগতে যুগপ্রবর্তকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সেই সময়কার লেখকরা বিশেষ প্রভাবিত হয়ে থাকেন। তবে রাজশেখর বসু রবীন্দ্রনাথকে এর থেকে ব্যতিক্রম বলেছেন, কারণ তাঁর বিশাল রচনাসম্ভার নিজস্ব শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও উদার রবীন্দ্রনাথ কোন রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়াননি।

সাধু ও চলিত ভাষা (১৯৩৩)

প্রাবন্ধিক বলেছেন সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে বিতর্ক প্রথমে শোনা গিয়েছিল বর্তমানে তা আর নেই। দুই রীতিতেই সাহিত্য রচিত হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের ভাষা বর্তমানে দু-রকম হয়েছে।

শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে সাধু রীতিতে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাই এই রীতি আমাদের সহজে আয়ত্ত হয়। তাছাড়া খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা এবং অধিকাংশ বইতে এই রীতি দেখা যায়। চলিত ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী - তীরবর্তি কয়েকটি জেলার মৌখিক ভাষার কিছু মাত্র মিল দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন - মৌখিক ও লৈখিক দুটি ভাষা আছে। মৌখিক ভাষা যেমনই বোধ্য ও সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষাই লৈখিক ভাষা। এই লৈখিক ভাষা সাধু ও চলিত যে কোন রীতির হতে পারে। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন করেছেন যে একটি রীতিতে কাজ চললে দুটি রীতির অনর্থক ব্যবহারের প্রয়োজন কেন। সাধু ভাষা অবাঞ্ছনীয় হলে তা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি? তাছাড়া সাধুভাষায় সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে এই সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার পাশে একটি অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করার চেষ্টা কেন?

প্রাবন্ধিক বলেছেন, সাধু ও চলিত উভয় ভাষার ভক্তরা বলবেন, সাধুভাষার ও চলিত ভাষার প্রকাশশক্তি ভিন্ন। দুই ভাষার প্রয়োজন না হলে সাহিত্য অঙ্গহীন হবে।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে চলিতভাষা পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার সমান - এ নিয়ে অনেক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিক ভাষা যে অঞ্চলের হোক তা মুখের ধ্বনিমাত্র শুনে বুঝতে হয় - এই ভাষা উচ্চারণ সর্বস্ব। লৈখিক ভাষার চেহারা আসল, তা সর্বসাধারণের ভাষা, তাই উচ্চারণ যাই হোক না কেন উচ্চারণে মিল থাকা দরকার।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভাষা শব্দকে আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। শব্দাবলীর প্রকার, শব্দের কোন রূপ প্রযোজ্য ও বর্জনীয় তার রীতি ও ভাষা, যেমন - সাধুভাষা। আবার ভঙ্গীর (Style) ভেদ ও ভাষা, যথা - আলালী, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, উপরের লক্ষণগুলি বিচার করলে দেখা যায় সাধুভাষা ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে কিন্তু চলিত ভাষা তা ব্যগ্রভাবে আত্মসাৎ করতে চায়। কারণ সাধুভাষায় বহুদিনের নিরূপিত পদ্ধতি চলছে। চলিত ভাষায় নিরূপিত পদ্ধতির অভাব। ''একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে।''[১১]

লৈখিকভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় এনে যদি সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হয় তবে একই লৈখিক ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস লঘুতম সাহিত্য সবই লেখা যাবে তবে বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্বের জন্য ভঙ্গীর পার্থক্য মাত্র হবে।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ আছে। কোন এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে লৈখিক ভাষা গড়তে হবে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার যোগ্যতা বেশী, কারণ এই ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র এবং রাজধাণীও বটে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর বেশী নির্ভর করলে চলবে না। লৈখিকভাষায় স্থানবিশেষে উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। ''লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সার্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়।''[১২] লৈখিক ভাষায় প্রচলিত সাধুভাষা ও মার্জিতজনের মৌখিক ভাষা দুই-এর সদ্‌গুণ থাকা উচিত। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ দিয়ে যে বাক্‌সংকোচ তাতেও আবার মৌখিক ভাষার সহজ প্রকাশশক্তির ও প্রয়োজন।

রাজশেখর বসু এই বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন -

১) ক্রিয়াপদ সাধুভাষার অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ কেউ নেবে না তাছাড়া এতে ভাষার কোন লাভও নেই।

২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপে গৃহীত হোক।

৩) সংস্কৃতজ এবং অসংস্কৃজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। অভ্যাসে অসুবিধে হলে কিছুর সাধুরূপ ও কিছুর চলিতরূপ নেওয়া হোক। যে শব্দের দুই রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপ থাকুক। যথা - 'ওপর, ভেতর, পেছন, পেতল' না লিখে 'উপর, ভিতর, পিছন, পিতল লেখা হোক। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে তার মৌখিকরূপই ব্যবহৃত হোক যথা - 'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠন, পুরনো।

৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিত ভাষায় চলে অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকরা যা ব্যবহার করেন তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

৫) চলিত ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হয় কিন্তু তা নয়। ধারণা হয়েছে - ''চলিত ভাষা একটি তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে শক্ত জমি চাই অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিত ভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।''[১৩]

সাধু ও চলিত কোন ভাষাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। চলিত ভাষার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তক রচনা, ব্যাকরণ ও অভিধানে চলিত ভাষার বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন। কালে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা

শেকস্পিয়রের ভাষার তুল্য সমাদৃত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল থাকবে না। শক্তিশালী লেখকের প্রভাবে চেষ্টায় সেই লৈখিক ভাষায় ও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।

গ্রহণীয় শব্দ (১৯৫৮)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভাবের বাহন ভাষা এবং ভাষার উপাদান শব্দ। শব্দের অর্থ সর্বগ্রাহ্য হলে তা সার্থক, প্রয়োগের উপযুক্ত, সাহিত্যে গ্রহণীয়।

বাঙলা ভাষা সজীব ও চলন্ত তাই স্বাভাবিকভাবে এতে পরিবর্তন ঘটবে। লেখক এর কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, বাঙালীর জীবনযাত্রায় নূতন ভাব রুচিও আচারের পরিবর্তন। অন্য কারণ হল, ইচ্ছাপূর্বক বা অজ্ঞাতসারে ইংরেজী ভাষার অনুকরণ।

ভাষায় পরিবর্তন বা সমৃদ্ধি কিছুটা কৃতী লেখকের প্রভাবে হয়। সাধারণ মানুষ ব্যাকরণ বা অভিধানের নিয়ম মেনে কথা বলে না ফলে অনেক সময় শব্দের উচ্চারণ বা প্রয়োগে ভুল করে, অনেকে সেই ভুলের অনুসরণ করে ফলে নূতন শব্দ, অর্থ এবং নূতন ভাষার উৎপত্তি হয়। ''ভাষা মাত্রেই পূর্ববর্তী কোনও ভাষার বিকার বা অপভ্রংশ এবং একাধিক ভাষার মিশ্রণ।''[১৪] ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষা, প্রকাশ-শক্তি বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় এবং গ্রহণীয় বা বর্জনীয় শব্দ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে।

এমন অনেক বিষয় বা বস্তু আছে যা নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয় নি তবে সংবাদপত্র, সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থে তা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছে। যেমন - যে কাঁচামাল থেকে বা খনিজ বস্তু থেকে লোহা তৈরি হয় তার বাঙলা নাম কি হতে পারে, ইংরেজী নাম, iron ore, বৈজ্ঞানিক নাম hematite অশিক্ষিত পাথর কাটার শ্রমিকরা এর নাম দিয়েছে লোহা-পাথর। বাঙলা কাগজে লেখা হয় লৌহপিণ্ড, খনিজ লৌহ, আকরিক

লৌহ তিনটি নাম ভুল। লৌহপিণ্ড মানে লোহার তাল বা lump of iron । খনিজ বা আকরিক লৌহ অর্থাৎ যে লৌহ খনি বা আকরে থাকে। খনি ও আকর একই শব্দ তবে পারিভাষিক প্রয়োগে meneral-এর বাঙলা খনিজ, ore-এর বাঙলা আকরিক। তাই iron ore-এর প্রতিশব্দ লৌহ আকরিক তবে লোহা পাথরও বলা যায়।

Atom bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন তবে পারমাণু বোমা লিখলে লেখক বলেছেন অনুবাদ যথার্থ হবে। তেমনি blackout শব্দের অর্থে নিষ্প্রদীপ না হয়ে অপ্রদীপ শব্দই গ্রহণীয়। তেমনি civil supply অর্থে অসামরিক সরবরাহ বলা হত civil শব্দের যথার্থ বাঙলা শব্দ ছিল না তাই নঞর্থক অসামরিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রাবন্ধিক বলেছেন thanks, please, kindly ইত্যাদি ইংরেজী শিষ্টাচার বর্তমানে বাঙালী সমাজেও প্রভাব বিস্তার করেছে। লেখক একটি ঘটনা বলেছেন একবার তিনি একটি মেয়ের খাতায় অটোগ্রাফে সহি করলে সে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। প্রাবন্ধিক তাকে প্রশ্ন করলেন কে ধন্য তুমি না আমি। মেয়েটি উত্তর দিল আমি। ধন্য শব্দের একটি অর্থ কৃতার্থ অপরটি খুব বাহাদুর। Thanks-এর বাঙলায় ধন্যবাদ এবং please, kindly স্থানে অনুগ্রহপূর্বক বা দয়া করে বলা যেতে পারে। হিন্দীতে 'কৃপায়' এই সংস্কৃত পদটি ব্যবহৃত হচ্ছে বাঙলাতেও তা মেনে নেওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের পক্ষপাত দেখিয়েছেন, যেমন - জীবনী, জন্মবার্ষিক পরিক্রমা, শতাব্দী, প্রকাশনা। তেমনি কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা - এখানে শুধু কার্যকরী বা কার্যকর লিখলেই চলে।

প্রাবন্ধিক বাঙালীদের ক্লীবলিঙ্গ প্রীতির দিকটাও দেখিয়েছেন। যেমন - রূপম, সুন্দরম, অবনীন্দ্রচরিতম্ ভরতনাট্যম ইত্যাদি। কবিরাজী দোকানে লেখা শ্রী আয়ুর্বেদম্ -

আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ কিন্তু শেষে 'ম্' যোগ হওয়ায় শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হয়ে গেল, তেমনি ভারতপুত্রম্ - এখানে 'ম্' যোগ করে ভারত পুত্র ও ক্লীবত্ব বরণ করলেন কেন সেটার সমাধান লেখকও কিছু দিতে পারেননি তাই প্রশ্নবোধক চিহ্নতে তাঁর এই প্রবন্ধ শেষ হয়েছে। সাহিত্যিকের রসবোধ ব্যঙ্গের মাধ্যমে এখানে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যালয়ের বাংলাভাষা (১৯৫২)

প্রাবন্ধিক বলেছেন 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু 'বিদ্যালয়ের বাংলাভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কথাসাহিত্য' আষাঢ় সংখ্যায় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং সেই সূত্র ধরে রাজশেখর বসু তাঁর মন্তব্য এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে বাংলা শিক্ষায় গোড়া থেকে যারা সুব্যবস্থা চান তাঁদের কৃষ্ণদয়ালবাবুর প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলি সযত্নে বিচার করা উচিত।

কৃষ্ণদয়াল বসু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাধুভাষায় লেখা অভ্যাস করা উচিত। কারণ শুধু চলিত ভাষা শিক্ষার ফলে বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ক্লাসিক শ্রেণীর রচনা ছাত্রদের অনধিগম্য ও অপঠিত থেকে যাবে। চলিত ভাষায় শিক্ষা লাভ করলে তদ্ভব দেশজ বিদেশী শব্দ সহজ সরল তৎসম শব্দ তারা আয়ত্ত করবে। ''আমার মতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনটাই মুখ্য, সাহিত্যদীক্ষার প্রয়োজন গৌণ।''[১৫] তাই নিম্নতম শ্রেণী থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশ সাধুভাষায় লেখলে তাঁর মতে ছাত্রদের উপকার হবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস ভবিষ্যতে সমস্ত সাহিত্য এমন কি সংবাদ পত্র ও চলিত ভাষাতেই রচিত হবে তথাপি তিনি কৃষ্ণদয়াল বসুর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন কারণ

''গত দেড়শ বৎসরে সাধুভাষার যে বিশাল বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার একটা বড় অংশ চিরায়ত বা ক্লাসিক হয়ে থাকবে।''[১৬] তাই সাধুভাষার চর্চা কোনদিনও লোপ পাবে না।

বাংলা সাধুভাষা বহুজনের চেষ্টায় বহুকালে সার্বজনীন রূপ নিয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গনেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকরা যে রীতির প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী লেখকরা তাঁদের অনুসরণ করেছেন। ফলে ভঙ্গী বা স্টাইলের ভেদ হলেও রীতি তাদের একই। চলিতভাষার প্রভাব ও নূতনত্বের প্রয়াসে সাধুভাষায় বিকার এলেও তা অধিক শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খলা থাকার জন্য সব জেলার লোক এই ভাষা শিক্ষা করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের ভাষার সাধুরীতিই অধিক প্রয়োজনীয়।

পরবর্তীকালে চলিতভাষা যদি সাধুভাষার মত সুশৃঙ্খল ও সর্বসম্মত হয় তবে চলিত ভাষা বাংলা শিক্ষার একমাত্র বাহন হবে।

চলিত ভাষার লক্ষণ সম্বন্ধেও সকলের ধারণা স্পষ্ট নয়। সর্বনাম ক্রিয়াপদ এবং কয়েকটি অসংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ছাড়া সাধুভাষার সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। কারো মতে তৎসম শব্দ বেশী থাকলে সাধুভাষা এবং তদ্ভব দেশজ ও বিদেশজ শব্দ বেশী থাকলে চলিত ভাষা। মূলতঃ, সাহিত্যিক প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional লৈখিক ভাষা হল চলিত ভাষা।

অবাঙালীদের মতে বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দ বেশী থাকলে তাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাই তৎসম শব্দ কমালে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যে যোগসূত্র আছে তা ছিন্ন হবে এবং বাংলা ভাষার প্রসার কমে যাবে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন সাধুভাষার কালক্রমিক সংস্করণ চলিতভাষা। সাহিত্যে সকল ভঙ্গীর স্থান আছে তবে হুতোম পেঁচার সেকেল বৈঠকী ভাষা, 'সমৃদ্ধ' লিখিত গল্পের বরিশালী ভাষা, সৈয়দ মুজতবা আলীর সিলেটী-আরবী-ফারসী-জার্মান-ফ্রেঞ্চের বিচিত্র আলাপের ভাষা, রূপদর্শীর স্ল্যাং-বহুল আড্ডার ভাষা - এইগুলি উপভোগ্য এবং সাহিত্যে স্থায়িত্ব পাবার যোগ্য। তবে এই লঘু ভাষা রসাত্মক হলে সবার্থসাধক নয়। তাই লেখকেরও মতে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা সাধু ও চলিত দুই ভাষায় লিখিত সাহিত্য পড়ে দিশেহারা হয়ে যাবে। তাই রাজনীতি ও চলিত ভাষা একটু বেশী বয়সে চর্চা করাটা প্রাবন্ধিক নিরাপদ বলে মেনে নিয়েছেন।

কৃষ্ণদয়ালবাবু নিম্নশ্রেণীতে ব্যাকরণের চাপ কমাতে বলেছেন। রাজশেখর বসুও এই প্রস্তাবে মত দিয়েছেন, কারণ ব্যাকরণ একটি analytical শাস্ত্র, ব্যাকরণ এর বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ। তাই প্রথমে বাক্যরচনা বা সংঘটন তারপর ব্যাকরণ শেখা যুক্তিসংগত। ছাত্র বই পড়তে পড়তে বানান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধিসমাসবদ্ধ পদ, বাক্যরীতি ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত করে। পরবর্তীকালে উচ্চতর শ্রেণীতে ব্যাকরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে বেশী ভাল হবে বলে প্রাবন্ধিকও মনে করেন।

প্রাবন্ধিক ছাত্রদের মাথায় ছোটবেলাতে ব্যাকরণের নিয়মের অনর্থক বোঝা দিতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে বই পড়তে পড়তে সহজভাবে বানান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধিসমাসবদ্ধ পদ, বাক্যরীতি সহজভাবেই আয়ত্ত করে নেবে। তাই উচ্চতর শ্রেণীতে ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করলে ব্যাকরণের নিয়মনীতিও সহজে শিক্ষা নিতে পারবে। স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত জ্ঞানের সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মসূত্র মিলে গিয়ে বিষয়টি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই রীতি মেনে নেওয়া হয়েছে তাই রাজশেখর বসুর সহজ শিক্ষার পাঠ এখানেও প্রাসঙ্গিক।

বাঙালীর হিন্দীচর্চা (১৯৫১)

ভারতীয় সংবিধানে পনের বছর পরে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহিত হবে এইজন্য বাঙালী সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তারই ফলস্বরূপ এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে তা মেনেই লেখক আমাদের প্রস্তুত হতে বলেছেন।

বাঙালীরা বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বলতে শুধু ইংরেজী ভাষা শেখেন প্রধানতঃ তিনটি কারণে - (১) জীবিকানির্বাহ (২) ভিন্নদেশবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা (৩) নানা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ। তবে পরবর্তিকালে হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষা হবে তখন জীবিকানির্বাহের জন্য হিন্দী ভাষাও অপরিহার্য হবে। ভারতীয় অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে হিন্দীতে আলাপ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে হবে। কায়িক শ্রমের সাহায্যে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ভবিষ্যতে তাদের হিন্দী না শিখলেও চলবে। ‘‘শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যেসব বৃত্তিতে অভ্যস্ত তা বজায় রাখার জন্য হিন্দী শিখতেই হবে।’’[১৭]

প্রাবন্ধিক বলেছেন হিন্দীর আধিপত্যে বাংলাভাষার ক্ষতি হবে এই চিন্তা ভিত্তিহীন। বাংলাভাষায় ইংরেজীর বাক্যরীতি বা ইডিয়ম এসেছে ইংরেজীর ভাব ও পদ্ধতি বাংলা ভাষা আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়েছে তবে নিজের বিশিষ্টতা হারায়নি। হিন্দী ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষা প্রভাবিত হবে তবে অভিভূত হবে না। তাই হিন্দী ভাষা রাজনীতিক মর্যাদা পেলেও বাংলা ভাষার ক্ষতি হবে না।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে শুধু পাঠশালা ও স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে বাংলা পাঠ্য বিষয় ছিল। কিন্তু বাঙালী লেখক মাতৃভাষার উন্নতি করে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি গবেষণার বিষয়রূপে ও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে তা বলা যায় না। যেসব লেখকরা পাঠশালায় বাংলা শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা ভাষার শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নূতন লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। বর্তমানে রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে গেছে, আধুনিক প্রয়োজনে ভাষা নব নব ভাবের ধারক হয়েছে এবং প্রকাশ শক্তি ও বেড়েছে। তবে বর্তমানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর ভাষার শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব দেখা দিয়েছে। ''সেকালের উপেক্ষা, একালের অসতর্কতা এবং ইংরেজীর প্রবল প্রভাব - এই তিন বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে।''[১৮] এর কৃতিত্ব বাঙালী লেখকের সহজাত সাহিত্যপ্রীতি ও নৈপুণ্য। তাই হিন্দী ভাষার প্রতিপত্তি বাড়লেও বাংলা ভাষার অনিষ্ট হবে না। ''অন্ধ বিদ্বেষ বা অদূরদর্শিতার বশে হিন্দীকে উপেক্ষা করলে বাঙালীর অশেষ দুর্গতি হবে।''[১৯]

সংবিধান সভায় যারা হিন্দী ভাষার জন্য বলেছিলেন তাঁদের মতে সংস্কৃত শব্দবহুল 'শুদ্ধ হিন্দী' ভাষা প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতীয় ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে - হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য মুখ্যত সংস্কৃত এবং গৌণত অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করা হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলা সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যের চেয়ে পরিমাণে না হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। ভাষা ভাবের বাহন মাত্র, তাই বাংলা গল্পের সমাদর অবাঙালী সমাজেও দেখা যায়। বাঙালী লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য এই গল্পের উৎকর্ষতা। তাই বাঙালী

সাহিত্যিকরা যদি হিন্দী সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন তবে হিন্দী ভাষাও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা নিকটতর হবে। নগেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অনেক গল্পে বিহারী ও উত্তরপ্রদেশী পাত্রপাত্রীর সমাবেশ দেখা যায়। তাছাড়া উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় এবং বনফুলের গল্পে অবাঙালী নর নারীরও মনোজ্ঞ চিত্র আছে। তাঁরা বাংলা দেশের বাইরে অন্য প্রদেশে ছিলেন তাই সেই সমাজের অনেক খবর রাখেন এবং অল্পাধিক হিন্দীও জানেন, তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন মাতৃভাষার চর্চার পাশাপাশি এঁরা মাতৃস্বসার ভাষা বা হিন্দী ভাষা নিয়েও পরীক্ষা করার চেষ্টা করতে পারেন।

হিন্দী ভাষা পরবর্তিকালে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পাবে - এই সিদ্ধান্ত উদার মনোবৃত্তির অধিকারী রাজশেখর বসু স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন। এবং রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হলেও বাংলা ভাষার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে কোন প্রভাব পড়বে না সেইকথা বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক যারা ভিন্ন প্রদেশে থাকেন এবং হিন্দী ভাষার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে তিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী সাহিত্য চর্চা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাজনৈতিকভাবে বাঙালীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মেধা মনন চর্চায় বাংলা সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ তাই এই লেখকরা যদি হিন্দী ভাষা চর্চা করেন তবে হিন্দী ভাষা আরো উন্নত হয়ে উঠবে। হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দ বেশী প্রায় ৭০% এবং বাকী ৩০% দেশীয় ভাষা থেকে গৃহিত হয়েছে। তাই আদি জননী সংস্কৃত চর্চা বা শিকড়ের সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ থাকল। বিহার উত্তরপ্রদেশের জীবনের স্বাদ আমরা বাংলাভাষাতে পাই কারণ ভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী বাঙালীরা তাঁদের রচিত বাংলা সাহিত্যে সেই প্রদেশগুলির চিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন।।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৫৬)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, কালচারের প্রতিশব্দ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, শব্দের বুৎপত্তিতে কৃষি বা কর্ষণের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দ পছন্দ করতেন না তাই তিনি সংস্কৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

Oxford Pocket Dictionaryতে culture-এর বিশিষ্ট অর্থ - Trained and refined state of the understanding and manners and tastes; phase of this prevalent at a time or place. - অর্থাৎ বুদ্ধি, আচরণ ও রুচির শিক্ষিত ও মার্জিত অবস্থা হল সংস্কৃতি।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গ্রন্থ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' - এই গ্রন্থের ভূমিকায় (তিনি লিখেছেন) যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন -

ত্রিবিধ অর্থে তিনি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করেছেন - (১) দেহের সুখ বিধান যে কৃতির লক্ষ্য তা সভ্যতা। (২) যদ্দ্বারা মনের সুখ সাধন হয় তা সংস্কৃতি (৩) যা দিয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কৃষ্টি।

উদাহরণ স্বরূপ - মহেন - জো - দেড়োর আবিষ্কৃত পুরাকৃতি সিন্ধুবাসীর সভ্যতার, ভারতনাট্যম প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি, নয়টি অঙ্ক দিয়ে যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশ বৈদিক আর্যদের কৃষ্টির পরিচয়।

ইংরেজী অভিধানের কালচার শব্দকে যোগেশচন্দ্র বিশ্লিষ্ট করে তিনভাগে ভাগ করেছেন। পার্থক্য স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি বলা যায় -

(১) ভারত - রাষ্ট্রের সংবিধান, দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, জলসেবা, ব্যবস্থা সেতু, লোহা, কারখানা, রেলগাড়ি, টেলিফোন, রেডিও, স্কুল কলেজ

হাসপাতাল প্রভৃতি বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে।

(২) প্রাচীন ও আধুনিক দেবমন্দির, স্তুপাদি, ভারতীয় সংগীত চিত্র ও মূর্তি নির্মাণ কলা, কীর্তন ও বাউলের গান, রবীন্দ্র সংগীত, প্রাচীন পদ ও আধুনিক চিত্র - পদ্ধতি ও বাংলা সাহিত্য।

(৩) ভারতীয় কৃষ্টির পরিচয় - সংস্কৃত বর্ণমালা, ব্যাকরণ ছন্দ অলংকার শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান। বাঙালীর বিশিষ্ট কৃষ্টির উদাহরণ - নব্যন্যায়, দায়ভাগ, শুভংকরের গণনা পদ্ধতি এবং বিধবা ও অসবর্ণের বিবাহের প্রবর্তন চেষ্টা, অনাবশ্যক বোধে টিকি বর্জন।

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালে কালে পরিবর্তিত হয়। বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার প্রধান অঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

প্রায় পাঁচশ বছর মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল তাই হিন্দু সংস্কৃতিতে আরবী, ফরাসী, তুর্কী শব্দ বাংলাভাষায় গৃহিত হয়েছে। ব্রিটিশ অধিপত্যের কাল দু'শ বছর কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার প্রভাব ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। কারণ ব্রিটিশ শাসনের উপর বিদ্বেষ থাকলেও তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও ইংরেজীর তুলনায় বাংলা ভাষার উপর কম প্রভাব পড়েছে। ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফসিলে যে চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার নাম আছে তাতে সংস্কৃত ভাষা থাকলেও ইংরেজী ভাষার নাম নেই। ইংরেজী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ভাষা অতএব অন্যতম ভারতীয় ভাষা - ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি ইংরেজী ভাষাকে তফসিলভুক্ত করার চেষ্টা করছেন, আমাদের সেই চেষ্টার সমর্থন করা উচিত।

ভারতের সমস্ত ভাষার জন্য রোমানলিপি বা script প্রবর্তন, তবে বর্ণমালা বা

alphabet যে ভাষার যেমন আছে তেমন থাকবে। ভারতীয় লিপি চিরকাল সমান ছিল না। প্রাবন্ধিকের মতে বিভিন্ন লিপি থেকে মিলনের যোগসূত্ররূপে রোমান লিপি প্রবর্তনের চেষ্টা আবশ্যক - এই প্রস্তাবও বহু আলোচিত হয়ে চাপা পড়ে গেছে।

প্রায় ষাট বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্থান ছিল না তথাপি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল কারণ, ''ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী সুধীজন নবদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, বাংলাসাহিত্যেও ইংরেজীর তুল্য সমৃদ্ধ হতে পারে এই বিশ্বাসে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন।''[২০] ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের জন্য সেই সাহিত্যের বিভিন্ন ভাব বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে।

হিন্দি ভাষা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা হলেও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব পড়বে না। তবে উৎকট হিন্দিপ্রেমিরা যদি বাংলা ভাষার উপর উৎপাত করেন তবে ভাষার সেই অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে বাংলা ভাষা।

বর্তমানে বাঙালীর ইংরেজীভাষায় জ্ঞান কমে যাচ্ছে তাই শুধু ইংরেজী ভাষা নয়, ক্লাসিক বাংলা রচনাও অবোধ্য হয়ে পড়েছে। এমনও শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা ও কালীসিংহের মহাভারত কিছুই বুঝতে পারেন না।

Oxford Dictionary-তে Culture-এর বিশিষ্ট অর্থ এবং তা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহিত অর্থ এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারে ইচ্ছা ও যুক্তিকে প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন।

ভাষা পরিবর্তনশীল, মুসলমান শাসনকর্তা ও ইংরেজ শাসনকর্তার আমলে বাংলা ভাষায় গৃহিত বিভিন্ন শব্দের কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দক্ষ ভাষাতত্ত্বিকের বিষয়কে তিনি রসাপ্লুত করে পরিবেশন করেছেন। ক্লাসিক ও সমসাময়িক

বাংলা ভাষা চর্চায় ইংরাজির অপরিহার্যতাও যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেছেন।

বাঙালী জাতি তাঁর ভাষাকে যথোচিত রক্ষা করতে পারে, এই ভরসা প্রাবন্ধিকের মনে দেখা যায়। নিজ জাতির আত্মগৌরবের চিত্র লেখনীতে ফুটে উঠেছে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ভারতবর্ষের এই চিরন্তন রীতি প্রাবন্ধিক বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেও যে বাংলা ভাষা তার মর্য্যাদা রাখতে পারবে একথা প্রাবন্ধিক গল্পছলে বলে সাহিত্যিক রস ভাষাতত্ত্বের মত বিষয়েও পরিবেশন করেছেন।

ভুল নাম ও নকল জিনিষ (১৯৫৬)

দিল্লির লোকসভায় প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত হয়েছে। লোকসভায় প্রশ্ন উঠেছে, বনস্পতিকে ভেজিটেবল ঘি বলা যায় কি। এরই উত্তরে ডক্টর রঘুবীর বলেছেন, ভেজিটেবল ঘি নামে কোন বস্তু নেই, কারণ জিনিসের ভেজালের চেয়ে নামের ভেজাল অনর্থকর।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, নামের ভেজাল বা শব্দের অপপ্রয়োগে চিরকাল চলেছে। অনেক সময় ভুল নাম কালক্রমে ভাষায় স্থায়িত্ব পায়। আবার অনেক সময় ভুল নামের সুযোগে নিকৃষ্ট নকল জিনিসও বাজারে প্রচলিত হয়।

তিল থেকে যা উৎপন্ন হয় তাই তৈল। ইংরেজী অয়েল শব্দের উৎপত্তি লাটিন অলিয়স থেকে যার মৌলিক অর্থ অলিভ জাত বা অলিভ অয়েল। কালক্রমে অর্থ প্রসারিত হয়েছে তাই যেকোন স্নেহদ্রব্য বা তত্তুল্য বস্তুকে তৈল বলা হয়। 'তালবৃন্ত' - তালগাছের ডাল, তা থেকে হল তালপাতার পাখা, পরে সংস্কৃত ভাষায় পাখার নাম হল তালবৃন্ত।

ইংরেজী অভিধানে ট্যাবলয়েনও শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছিল - ঔষধাদির চাকতি

অর্থাৎ ট্যাবলেট। ট্যাবলয়েড শব্দের যাঁরা প্রবর্তক তাঁরা জানালেন যে ওই নামে শুধু তাঁদের তৈরি জিনিস বোঝায়, অভিধানে তার ব্যাপক অর্থ দেওয়া হয়েছে তাই অভিধান সংশোধিত হল।

বিশেষ কম্পানির প্রস্তুত বীজঘন বস্তুর পেটেণ্ট না ফিনাইল কিন্তু সাধারণ লোক এই ধরণের সব বস্তুকে ফিনাইল বলে। থার্মস একচি বিশেষ কম্পানির নাম কিন্তু সব ভ্যাকুয়ম ফ্লাক্সকে থার্মস বলে। তেমনি ভ্যাসেলিন একটি আমেরিকান কম্পানির পেটেণ্ট, মানুষ অনুরূপ সব বস্তুকে এই নাম দিয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগে একটি আমেরিকান কম্পানি কেড্‌স নামে ক্যাম্বিসের জুতো এদেশে পাঠিয়েছিল। বর্তমানে কেড্‌স মানেই ক্যাম্বিসের জুতো বোঝায়।

কাগজে দশ-বারো টাকার নাইলন শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখা যায়, এইদামে নাইলনের মোজা ও পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় রেয়ন বা নকল রেশমের শাড়িকে নাইলন নাম দিয়ে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

মিষ্টান্নের হলদে রংকে ময়রা বলে জাফরান। কুঙ্কুম শব্দের অর্থ জাফরান, এককালে মেয়েরা জাফরান বেটে কপালে টিপ পড়ত। বর্তমানে যে কোন খয়ের রঙের পিষ্ট বস্তুকে জাফরান বা কুঙ্কুম বলা হয়।

প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদকের ভরিতে দশ আনা খাদ ভেজাল দেওয়ার কথা বলেছেন তবুও সেটা গোল্ড মেডেলই বলা হচ্ছে তাই দোকানদার সের পিছু দশ ছটাক ভেজাল দেওয়া জিনিসকে ঘি নামে চালায় তা আইনে দণ্ডনীয় হয় না। তবে কি স্বর্ণপদক খাবার জিনিস নয় তাই ভেজাল দিলে আইন ভঙ্গ হয়না।

তেমনি অনেক ভুল নাম প্রয়োগসিদ্ধ বা আইনসম্মত। তাল-বর্গীয় সাগু গাছের মজ্জা থেকে যে স্টার্চের দানা প্রস্তুত হয় তাই সাগুদানা তেমনি ক্যানা বা সর্বজয়া শ্রেণীর এক প্রকার গাছের মূল থেকে তৈরি স্টার্চের নাম এরারুট (অ্যারোরুট)। পরবর্তীকালে টাপিওকার পালো তৈরি দানা সাগুর মত দেখতে ও খেতে তাই তাও সাগুদানা নামে প্রচলিত হল এরারুটও ভুট্টার স্টার্চ হতে পারে। প্রাবন্ধিক বলেছেন যে আইন করে সকল খাদ্য বস্তুর সঠিক নাম প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারত সরকার টাপিওকার পালো ও চীনাবাদামের খোল দিয়ে সিন্থেটিক রাইস তৈরির চেষ্টা করছে যার রূপ ও পুষ্টিগুণ চালের মতই হবে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল (ইন্ডিগো) কর্পূর, মেন্থল প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে তার আণবিক গঠন ও গুণ স্বভাবজাত বস্তুর সমান বা প্রায় সমান তাই তার সিন্থেটিক বিশেষণ সার্থক। তবে চাল, ডাল, মাছ, মাংস প্রস্তুত করা মানুষের অসাধ্য তাই তা কখনও সিন্থেটিক হতে পারে না তবে ইমিটেশন বা নকল রাইস বলা যায়।

কোন ভুল নাম দিয়ে বাজারে নকল জিনিস বেচা কেনা করার বিষয়টি প্রাবন্ধিক বিভিন্ন উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। নামের বাহারে বস্তু ব্যবসায়ের প্রলোভনের দিকটি তাঁর বিশেষ নজরে এসেছে। এই ক্ষুদ্র অথচ নিত্যদিনের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় দিকটি প্রাবন্ধিক তাঁর সহজ সরল অথচ বিজ্ঞানসিদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন।

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া (১৯৫৫)

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী পণ্ডিত Diderot, D'Alembert,

Voltaire, Euler ইত্যাদি কয়েকজন মিলে Encyelopedia নামে একটি গ্রন্থমালা রচনা করেন। এই নামটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভুত এর মৌলিক অর্থ - বিদ্যাপরিবৃতি অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। পরবর্তিকালে ইংরেজী Encyclopedia Britannica সংকলিত হয় এবং তার অনেক সংস্করণও গ্রন্থে বিশেষজ্ঞের লেখা প্রামাণিক বলে গণ্য হয়।

উপরের গ্রন্থদুটির মতো নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক আবদ্ধ 'মহাকোষ' গ্রন্থ দুটি। প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''নানা বিদ্যার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতিসংবলিত কোষগ্রন্থের সম্পাদন একজনে সাধ্য নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন প্রামাণিক সংকলণ অসম্ভব।''[২১]

নগেন্দ্রনাথ ও অমূল্যচরণ মহাশয়ের কাজ অসাধারণ অধ্যাবসায়ের ফল এই গ্রন্থটি বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রয়োজনে রচিত হয়েছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' গ্রন্থটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই অদ্বিতীয় গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রাবন্ধিক খুশী হয়েছেন। তবে তাঁর মনে হয়েছে যে ছোট সুসংকলিত প্রামাণিক বাংলা সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থটির নাম 'বিশ্বকোষ' বা 'বিষয়কোষ' দেওয়া যায় তবে প্রাবন্ধিক বইটির বিশেষ উদ্দেশ্য বলেছেন - বিষয় অর্থাৎ পদার্থ (subject), জাতি (class), ব্যক্তি (individual), স্থান, ঘটনা প্রভৃতির বিবৃতি থাকবে। শব্দকোষ যেমন ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সহায় ঠিক তেমনি বিষয় কোষে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন ও জ্ঞান লাভের সহায় হবে।

লেখক বিষয়কোষ বর্ণনাক্রমেই সংকলিত করার কথা বলেছেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, জীবন চরিত ইত্যাদির কথা থাকবে। যেমন অবিভক্ত ভারতের নগর, পর্বত, নদী

মন্দিরাদি, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, শাল, সেগুন, ধান, যব, গম, আম, কাঁঠাল, কলা। ভারতের বিভিন্ন উদ্যেগ ও ব্যবসাকেন্দ্র, কারখানার কথা থাকবে। তেমনি চন্দ্রগুপ্ত, কালিদাস, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ, বরাহমিহির, গান্ধী, সিপাহী বিদোহ, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য কলা থাকবে। আলেকজাণ্ডার, হিউএনসাং, মহম্মদ ঘোরি অলবেরুনি, ভিক্টোরিয়ার কথা থাকবে কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছিল। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ জরথুস্ত্র খ্রীষ্ট, মহম্মদ সেন্ট টমাস ইত্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ধর্মীয় সম্বন্ধ আছে। কংগ্রেস, মোসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদির কথা থাকবে।

প্রাবন্ধিক বিষয়কোষ রচনার প্রস্তাব রেখে বলেছেন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। তাঁরা এক বা একাধিক সম্পাদকের নির্দেশে লেখবেন ও তথ্য যোগান দেবেন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাই লেখক বলেছেন যে বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপদেশ নেওয়া ও তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য রাজশেখর বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা বলেছেন তাছাড়া বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি ও ধনী বাঙালী ব্যবসায়ীও এই বিষয়ে উদ্‌যোগী হতে পারেন।

এমন গ্রন্থ রচনায় এমন মানুষের প্রয়োজন যাঁরা ভূগোল ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিবিধ বিজ্ঞান, কৃষি গোপালন, খনিকর্ম শিল্প চিকিৎসা স্বাস্থতত্ত্ব আইন রাজনীতি অর্থনীতি পরিসংখ্যান প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব লোকাচার সাহিত্য চারুকলা স্থাপত্য, বিবিধ ধর্মসম্প্রদায় খ্যাত লোকের জীবনচরিত ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কর্মঠ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিকে সম্পাদক করা উচিত এবং সকলকে পরিমিত পারিশ্রমিক ও দিতে হবে।

প্রাবন্ধিক আশা প্রকাশ করেছেন যে উৎসাহী সুশিক্ষিত লোক অগ্রণী হলে এমন

একটি গ্রন্থ রচনা বাঙালীর পক্ষে অসাধ্য হবে না।

এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় 'সাইক্লোপিডিয়া' লেখায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। এই গ্রন্থ কীভাবে রচিত হবে তার একটি রূপরেখা অঙ্কণ করেছেন এভং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে ও তিনি বলেছেন। তাছাড়া বাংলায় এই গ্রন্থ প্রচারিত হলে আমাদের সুবিধার দিকটিও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার (১৯৫০)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, মানুষের কথা ও আচরণে বিভিন্ন ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি কোন ব্যক্তিগত লক্ষণ এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করতে দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলে। এই মুদ্রাদোষ ব্যক্তি, জাতি বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেও দেখা যায়। উদাহরণ রূপে লেখক দেখিয়েছেন, দক্ষিণ ভারতের। পুরুষ লজ্জা জানাতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। ইংরেজরা সকৌতুক পথ চলতে চুল ঠিক রাখার জন্য কেবলই মাথায় হাত বুলোয়। অনেক বাঙালী মেয়ে নিজের সাজ ঠিক আছে কি না দেখার জন্য নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে। তবে এই প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে সম্প্রতি যে মুদ্রাদোষ ও বিকার ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।''[২২] সংস্কৃত ভাষা থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন - গদ্‌গদ, বর্বর জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা জোড়া শব্দ বা শব্দদ্বৈতকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন -

১) পুনরাবৃত্তি বাচক - মধ্যে মধ্যে, বারে বারে হাড়ে হাড়ে।

২) পরস্পর সংযোগ বাচক - বুকে বুকে কাঠে কাঠে।

৩) নিয়তবর্তিতা বাচক - সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে।

৪) দীর্ঘকালীনতা বাচক - চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া।

৫) বিভক্ত বহুলতা বাচক - অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি, ঝুড়ি।

৬) প্রকর্ষ বাচক - টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে।

৭) অসম্পূর্ণতা বাচক - যাব যাব, শীত শীত, মানে মানে, নিজে নিজে।

৮) অনির্দিষ্ট বাচক - পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি, গোলা গুলি, কাপড় চোপড়।

বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। হিন্দী ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতে অল্পাধিক শব্দদ্বৈত দেখা যায়। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন - ''শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না।''[২৩] তবে অনবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে বার বার প্রয়োগ করা হলে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। অনুপ্রাসযুক্ত ও প্রত্যেকটির অর্থ মিলিয়ে জোড়া শব্দ ও দেখা যায়, যেমন - মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ-সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন প্রভৃতি জোড়া শব্দ খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। তবে প্রাবন্ধিক বলেছেন, যেখানে একটি শব্দ ব্যবহারে অর্থ পরিস্ফুট হয় সেখানে এইরূপ জোড়া শব্দ বার বার ও অনর্থক প্রয়োগকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক শব্দের স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশ শক্তি আছে তাকে অভিধা বলে। এই স্বাভাবিক অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য যদি একটির সঙ্গে আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুটিরই শক্তি কমে যাবে। তাই যেখানে একটিতে কাজ চলে সেখানে দুটি শব্দ না লিখলেও চলে।

ভাষা শিক্ষার প্রধান উপায় সংবাদপত্র, সেখানের ভাষার প্রয়োগ রীতিকে মানুষ শিষ্ট রীতি মনে করে তাই সংবাদপত্রের ভাষা ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা রক্ষা করা উচিত।

প্রাবন্ধিক বলেছেন শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। উদাহরণ দিয়েছেন - ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে এখানে নেতাজী বা সুভাষ যে কোন একটি ব্যবহার করলেই চলত। তেমনি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্টীটের জায়গায় নীলরতন বা বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম ব্যবহার করলে অমর্যাদা হত না কারণ যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর প্রয়োজন হয় না। তবেও অনেকে প্রত্যেকবার নাম উল্লেখের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখেন, লেখক বলেছেন - ''কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁরে অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন।''[২৪] তবে রবীন্দ্রনাথ এইক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের মতে অনেক ভাগ্যবান তাই তিনি তুচ্ছ বিশেষণের উর্দ্ধে উঠেছেন তাঁর নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়। ''যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে।''[২৫]

অনেক বাক্যে অকারণ শব্দবাহুল্য দেখা যায়, যেমন - 'সন্দেহ নাই', স্থানে 'সন্দেহের অবকাশ নাই', 'চা পান' স্থানে 'চা পর্ব', 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে প্রয়োগ সার্থক হতে পারে। তবে এই প্রয়োগ বেশী হলে মুদ্রাদোষ হবে। শব্দের অপচয়ে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক বা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করে থাকেন। উদাহরণরূপ তিনি বলেছেন, এক গল্পকারের চার

পৃষ্ঠা রচনায় পঁচিশবার 'রীতিমত' শব্দ দেখেছেন। তেমনি অনেকে 'বৈকি' প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। অনেকে অকারণে বিস্ময় চিহ্ন (!) দেদার বিন্দু (...) অনাবশ্যক 'হস-চিহ্ন দিয়ে থাকেন তা লেখকের মুদ্রাদোষ।

একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের বাংলা ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। ''ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচার ব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে।''[২৬] যেমন নাম জিজ্ঞাসা করলে, মিষ্টার বাসু, মিসেস রয়, মিস ডাট। তেমনি বানানেও শীলা Sheila, অনিল লিখতে Oneil বরেন হয় Warren। প্রাবন্ধিক ব্যঙ্গ করে বলেছেন - ''এরা স্বনামের ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না।''[২৭] তাছাড়া মিস মিসেস লিখে কুমারী বা অকুমারী বোঝাবার বিশেষ কি কোন দরকার আছে কারণ শ্রীমতী শব্দ সধবা বিধবা কুমারী সকল নারীর ক্ষেত্রেই পূর্বে ব্যবহার করা হত। পুরুষের কৌমার্য ঘোষনা করা হয় না সেখানে নারীর কোমার্য ঘোষনার কোন প্রয়োজন আছে বলে লেখক মনে করেন না।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, যেখানে বাংলায় লিখলেই চলে সেখানে ইংরেজী অক্ষর বা বানানের প্রয়োজন নেই যেমন - আর জি.কর কলেজ না লিখে রাধাগোবিন্দ কলেজ লিখলেই চলত বা কলোচিত হত। কারণ ইংরেজী নাম ও বিজ্ঞাপন লিখে ইংরেজী মুরব্বীর প্রশংসা পাওয়ার বর্তমানে কোন কারণ নেই।

প্রবন্ধটি ১৯৫০ সাল অর্থাৎ স্বাধীন ভারতবর্ষে রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এক বিশেষ স্থানে ছিল। তাই সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় অনর্থক একই শব্দের বার বার প্রয়োগ দৃষ্টিকটু এবং অবশ্যই মুদ্রাদোষ। প্রাবন্ধিক বাংলা ভাষায় এই ছোট অথচ ভাষায় দুর্বলতার দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। ভাষা

অলংকরণের জন্য শব্দদ্বৈত অনেকসময় ব্যবহার করা যায় তবে এর অনর্থক প্রয়োগ অবশ্যই বর্জনীয়। তাছাড়া যেখানে সহজ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা যায় সেখানে ভাষাকে জটিল করার প্রয়োজন নেই। বিগত দু'শত বছরের ইংরেজদের কাছে পরাধীন থেকে বাঙালীর ইংরেজ প্রীতি বেড়েছে তা তিনি পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ যেখানে উপযুক্ত বাংলা শব্দ আছে সেখানে ইংরেজী নাম বা শব্দ লেখার প্রয়োজন নেই।

শব্দদ্বৈত ভাষাকে সবসময় শক্তিশালী না করে দুর্বলও করে দিতে পারে সেদিকে লেখকের সূক্ষদৃষ্টি। ভাষাবিজ্ঞানী রাজশেখর বসুর তীক্ষ্ণ নজর ভাষার অর্থ ও সৌন্দর্য প্রকাশের দিকেও তিনি সহজ ভাষায় উদাহরণ সহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

স্বাধীণোত্তর কালে যদিও আমরা স্বাধীন হয়েছি তবে ইংরেজ শাসনমুক্ত হওয়ার পরও বাঙালী আত্মঅবমাননার ভিতর থেকে বের হতে পারেনি তা আমাদের ভাষাব্যবহার প্রকাশিত হয়েছে লেখক সে থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্র রচনার বানান (১৯৪৩)

বাংলা ভাষার অগণিত শব্দের ব্যাকরণ সম্মত একাধিক বিকল্প বানান - এই ভাষা শিক্ষাকে জটিল ও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। এই সমস্যার সমাধান ও নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করায় ১৯৩৬ সালে বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয় এবং এর সভাপতি রাজশেখর বসু নির্বাচিত হন।

রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সময় বিশ্বভারতী বানানের সমতা ও সরলতা নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অনুভব করেন, তাই শ্রী কানাই সামন্ত রাজশেখর বসুকে কিছু প্রশ্ন করে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তারই উত্তর নীচে সন্নিবদ্ধ করা হল।

১। কবির সকল বই-এর বানান ইত্যাদি সমান হওয়া উচিত। কিন্তু কবি নিজে একই পদ্ধতিতে চলেননি তাই সর্বমান্য কোন পদ্ধতি নেই। তাছাড়া কবির গ্রন্থাবলীর জন্য একটা সম্পূর্ণ পদ্ধতি খাড়া করাও বৃহৎ ব্যাপার তাই যথাসম্ভব সংগতিরক্ষার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই।

কবি ইলেক পছন্দ করতেন না। ৫/৬ বৎসর আগে প্রাবন্ধিক তাঁকে বলেছিলেন ও-কার লেখার চেয়ে ইলেক দেওয়া সোজা তাতে উচ্চারণ বোঝানো যায়, শব্দের পূর্বরূপ বিকৃত হয় না। কবি এই যুক্তি মেনেছিলেন। তখন হ'ক হ'ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা না হলেও প্রাবন্ধিকের ধারণা - ক্রিয়াপদের একটি বড় ফর্দ কবির সামনে ধরলে তিনি সংগতি রক্ষার উপায়রূপে এই বানান মেনে নিতেন। করি না, করি নে, গরু, গোরু - দুইই ঠিক।

২। কি, কী । - প্রাবন্ধিক কবির মোটামোটি অভিপ্রায় বলেছেন। অব্যয় কি (তাই কি? তাই নাকি, হাঁ কিনা)। সর্বনাম কী (কী চাই, বল কী।) বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণ কী (কী জিনিস, কী করিয়া, কী বুদ্ধি)। বোধ হয় সর্বত্র এই নিয়ম মানেননি।

৩। দুই শব্দের মধ্যে হইফেন থাকবে, কি ফাঁক হবে কিংবা জুড়ে দেওয়া হবে এই নিয়ম বাঁধা অসম্ভব। তাই ছাপাকর্তাদের এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক তাদের নিজস্ব মতে চলতে বলে নিজস্ব মত ও দিয়েছেন - বহুবচন বাচক্ শব্দ জোড়া হবে (লোকগুলো, যে সকল) দ্বিরুক্ত শব্দে ফাঁক (বার বার, ধীরে ধীরে) দ্বিতীয় শব্দ অর্থহীন হলে (কাপড়চোপড়, গাছপালা) অনুকার শব্দ জোড়া (চনচন, ঝনঝন)। ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণবাচক হলে জুড়লে ভাল হয় (এজন্য, যেহেতু, যেরকম, সবচেয়ে, সবসুদ্ধ, হয়তো) জোড়া বা না-জোড়া অনেকসময় উচ্চারণের উপর নির্ভর করে - যেকেউ, যেমানুষ (যে মানুষ)। হাইফেন যথাসম্ভব কম হলে ভাল।

৪। কবি অসংস্কৃত শব্দে ঈ-কারের বিরোধী ছিলেন। কবির লেখায় ব্যতিক্রম আছে (চয়নিকা ৩০ সং) - কাঙালিনী, বিজুলী, বিজুলি, পাখী, পশ্চিমী, বাঙালী, চখা, চখীরে, চাহনী, ময়ূরকণ্ঠী, মাসী, বাঁশরী, হিন্দুস্থানী, গয়লানী।

৫। কবির পুরনো বই-এ ইংরাজি ইংরেজি দুইই কিম্বা স্থানে ং-এর স্থানে 'ম' লিখেছেন সেখানে বদলাবার দরকার নেই।

৬। কবি প্রাবন্ধিককে বলেছিলেন - বাংলা প্রয়োগে শব্দের শেষে বিসর্গ অনাবশ্যক (সংস্কৃতে মনঃ দুর্বাসাঃ, স্বতঃ, বাংলায় মন, দুর্বাসা, স্বত)।

৭। হস্-চিহ্ন সম্বন্ধে কবির মত প্রাবন্ধিক জানেন না, বোধ হয় সংস্কৃত শব্দের অধিকাংশ স্থলে হস্-চিহ্ন বজায় রাখা ভাল - (ব্যতিক্রম- ভগবান, বলবান, বুদ্ধিমান, বিপদ, দিক ইত্যাদি বহু শব্দ)। অসংস্কৃত শব্দে নিতান্ত দরকার না হলে হস্ চিহ্ন বর্জনীয়। খণ্ড-ত প্রাবন্ধিকের পছন্দ নয় তবে জগৎ স্থানে জগত লিখলে চলবে না। চলন্তিকা ৪র্থ সংস্করণে অনেক অসংস্কৃত শব্দে 'ৎ' স্থানে 'ত' দিয়েছেন (ওত, তফাত, মেরামত, শরবত) বুদবুদ, প্রগল্ভ - হস্ - চিহ্ন আবশ্যক। সংস্কৃতে ষড়্দর্শন, ষড়যন্ত্র; বাংলায় সাধারণে হস্-চিহ্ন দেয় না।

৮। কার্তিক, বর্তিকা শুদ্ধ পাণিনিসম্মত। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ঢাকার গোবর্ধন শাস্ত্রী প্রমাণ দিয়েছেন। 'পাশ্চাত্য' অনেকে লেখেন তবে 'ও্য' লিখলে আর ভাল হয়।

৯। দৃষ্টিকটূ না হলে যুক্তাক্ষর কমানো ভাল।

কবি প্রাবন্ধিককে বলেছিলেন বাংলায় ঐ ঔ সর্বত্র তা হওয়া সম্ভব নয়, যেমন - সংস্কৃত পৌষ বাংলায় সমান উচ্চারণ আছে তাই পউষ লেখা অনুচিত। প্রাবন্ধিক বলেছেন, ঐ (that) স্থানে সর্বত্র ওই লিখলে দৃষ্টি কটু হবে।

১০। বানান সমিতি কেবল কয়েকটি শব্দে য-এর বদলে জ-এর ব্যবস্থা করেছেন (কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জোড়া, জোত, জোয়াল) অন্য শব্দে 'জ' কি 'য' কানাই সামন্তরা স্থির করবেন। খৃষ্ট স্থানে খ্রীষ্ট বা খ্রীস্ট লেখা ভাল। নবাগত অসংস্কৃত শব্দে রি বা রী স্থানে ঋ লেখা অনুচিত কারণ ঋ-কারের মূল উচ্চারণ তা নয়। বাংলা উচ্চারণে শ ষ স সমান কিন্তু notice লিখতে নোটিশ না লিখে নোটিস, বার্নিশ ঠিক।

১১। মর্ত্য, মর্ত; অর্ঘ, অর্ঘ্য - সবই শুদ্ধ। বাংলায় মর্ত্য বেশী চলে। অর্ঘ, অর্ঘ্য - কিছু অর্থভেদ আছে।

১২। ইলেক দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন।

১৩। অর্থবোধে বাধা হলে হাইফেন দেওয়া ভাল। উদাহরণে হাইফেন না দিলেও চলে।

১৪। বাংলায় যে শব্দে অ্যা উচ্চারণ আছে অথচ বানানে এ-কার বহুপ্রচলিত, সেখানে কবির রীতি অনুসারে দেওয়া উচিত।

১৫। কবির লেখার আগে ? এবং ! চিহ্ন খুব থাকত শেষে প্রায় বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সর্বত্র বাদ দিলে মানে বোঝা শক্ত হবে। বাক্যের প্রথমে এমন কি, অর্থাৎ আর কিন্তু থাকলে স্থলবিশেষে কমা দিলে ভাল হয়।

রাজশেখর বসু

৩০-০৪-৪৩

রবীন্দ্রনাথের বানান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক পত্রের বয়ানে তৎকালীন বাংলা ভাষাকে জরিফ করা এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষপাত শূন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে তদ্ভব, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী বিদেশী বিভিন্ন শব্দ আছে সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন উৎসের কথা মনে রেখে বানান বিধির সংস্কারে লেখক পক্ষপাতী।

বর্তমানকালে রাজশেখর বসুর প্রদর্শিত বানান বিধির কাঠামো কিছুটা পরিমার্জন পরিবর্ধণসহ বানান বিধি কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে তাই রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে তৈরি বানান বিধি বর্তমানেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

ভাষা ও সংকেত (১৯৩১)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, ভাষা একটি নমনীয় পদার্থ তাকে টেনে বাঁকিয়ে চটকে আমরা নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করি। তেমনি নরম জিনিসে কোন পাকা কাজ হয় না, তাই পরিভাষার উদ্‌ভব হয়েছে। ''পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই।''[২৭] আলংকারিকের ভাষায় পরিভাষার ব্যঞ্জনা, লক্ষণা শক্তি নেই তবে অভিধা শক্তি আছে। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত করে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।

ভাষা ও পরিভাষায় যা সব সময় হয় না, তার জন্য সংকেতের সাহায্য নেওয়া হয়। প্রাবন্ধিক উদাহরণ দিয়েছেন - ইমারত গড়তে শুধু বর্ণনায় পবিকল্পনা বোধগম্য হয় না তাই নকশা আঁকা হয়। নকশা হল সংকেতের সমষ্টি মাত্র - ''অভিজ্ঞ, লোকের কাছে নক্‌শা বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তা প্রায় নিরর্থক; বরং ছবি দেখলে বা বর্ণনা পড়লে সে কতকটা বুঝতে পারে।''[২৮] গানের স্বরলিপি ও সংকেত। লেখকের মতে, একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে বোঝাবার সুপ্রযোজ্য, সংক্ষিপ্ত, সস্তা উপায় সংকেত। সংকেতের জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির তাই সংকেতের পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ যে জানে সে সহজেই নির্দিষ্ট বিষয়টিকে বুঝতে পারে। প্রাবন্ধিক মজা করে বলেছেন যে নায়ক-নয়িকার সংকেতের বিষয় উপরোক্ত বিষয়ের সঙ্গে মিলে না।

বিজ্ঞানী বিভিন্ন সংকেতের উদ্‌ভাবন করেছেন। ভবিষ্যতে হয়ত স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের

জন্য সংকেত ব্যবহৃত হবে। হয়ত দোকানে সন্দেশ কিনতে আমরা বলব মিষ্টতা-৩, কাঠিন্য-২ দাও। ''তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হবে না, যা সত্য তাই সাংকেতিক বর্ণনায় অবধারিত হবে।''[২৯]

পরিভাষা ও সংকেতের মোড়কে ভাষায় প্রকাশিত ভাব কঠিন রূপ পেলে লেখকের প্রশ্ন কবিদের কী হবে। কবি প্রত্যক্ষ বিষয় শুধু বিশ্লেষণ করেন না। ''প্রত্যক্ষ ছাড়া ও যে অনুভতি আছে, যা মানুষের সুখ-দুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যার আশেপাশে মাথা ঠুকছে, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্বথা নমনীয় নির্বাধ ভাষাই তাঁর প্রকাশের উপাদান, তাতে ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন।''[৩০]

আদি কবিকে নারদ বলেছেন -

'- সেই সত্য যা রচিবে তুমি', ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' - কবির মনোভূমি সব চেয়ে বেশি সত্য, এখানে যা সৃষ্টি হবে তার সত্যাসত্য বিচার করার প্রয়োজন নেই।

বিজ্ঞানের ভাষার জন্য যেমন পরিভাষা সংকেত ইত্যাদি কঠিন জিনিসের প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিতে কবির মনোভূমি এবং নরম ভাষা যথোপযুক্ত।

বাংলা পরিভাষা (১৯৩৩)

প্রাবন্ধিক অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ নির্দেশ করেছেন - সংক্ষেপার্থ শব্দ। ''যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা।''[৩১] তবে 'পরিভাষা'র শব্দাবলী সাধারণত পণ্ডিতদের সম্মতিতে স্থির হয় এবং দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করে তা নির্দিষ্ট অর্থ বোঝায়।

বিদ্যাচর্চায় পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন। তবে যে জিনিস সাধারণের কাজে লাগে তারও পরিভাষিক নাম সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। পূর্ব কোন জিনিসের নতুন পারিভাষিক নাম পণ্ডিতরা প্রচলন করার চেষ্টা করলে সাধারণের দিক থেকে বাধা আসতেও পারে।

উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। মাতৃভাষা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন তাই নিম্নশিক্ষায় বাংলাভাষা শেখানো হচ্ছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, মাতৃভাষায় প্রয়োগের পরিভাষা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। পরাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অবিষ্কারও অল্প হয় এবং এই সংবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। লেখকের মতে, ''বাংলা দেশ যদি স্বাধীন হত, রাজভাষা যদি বাংলা হত, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলণ্ডে হয়েছে।''[৩২] তাই বাংলা ভাষায় পরিভাষা তৈরি সহজ জিনিস নয় এবং সর্ববস্থায় এক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রবল প্রতিযোগিতা আমাদের মনে রাখতে হবে।

বাংলা পরিভাষা প্রচলনের জন্য বিভিন্ন লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধে যদি একই প্রকার পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তবে প্রচার কিছুটা সহজ হবে।

পরিভাষা সংকলনের দিকে তাকালে দেখা যায় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ' - এর দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহিত হয়েছে। 'প্রকৃতি' পত্রিকায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। কিন্তু এই পরিভাষা সহজভাবে প্রচারে অসুবিধা আছে। (১) একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ তাই গ্রহণযোগ্য শব্দ নির্বাচনে সমস্যা। (২) সংগ্রহ বৃহৎ হলেও অসম্পূর্ণ। (৩) ইংরেজী পরিভাষার বিপুল

প্রতিষ্ঠা।

এই প্রবন্ধে লেখক 'পরিভাষা' বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখে তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন এবং ব্যবহারের উপায় সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করেছেন - পরিভাষার বিভিন্ন শ্রেণীভাগ হল -

বিশেষ (individual) - সূর্য, বুধ, হিমালয়।

দ্রব্য (বস্তু, substance, সামগ্রী, article) - কাষ্ঠ, লৌহ, জল, দীপ, চক্র, অরণ্য।

বর্গ (class) - ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।

ভাব (abstract idea) - গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।

বিশেষণ (adjective) - তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।

ক্রিয়া (verb) - চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। যেমন - দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র - এই শব্দ কোন শ্রেণীতে পড়ে তা স্থির করা কঠিন।

জ্যোতিষ ও ভূগোল-এ বিশেষ বাচক শব্দ, দ্রব্যবাচক শব্দ রসায়নে, বর্গবাচক শব্দ জীববিদ্যায় ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দ সকল বিদ্যায় প্রায় সমান। পরিভাষা একসঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়াবাচক এবং বিশেষবাচক শব্দ।

লেখক বলেছেন 'পরিভাষা' সংকলনকর্তা ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সামনে রেখে কাজ করবেন। ইংরেজী পরিভাষার জাতি নির্দেশ করেছেন -

ক) সাধারণ ইংরেজী শব্দ - iron, solid

খ) প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ - lesion, canyon, breccia, typhoon, toten.

গ) গ্রীক লাটিন (আরবী সংস্কৃত বিরল) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ - atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate.

ঘ) কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ - glycerine, methanal, aniline, farad

প্রাবন্ধিক বলেছেন পরিভাষা সংকলনের সময় নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে -

ক) সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ) হিন্দী উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

গ) ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ।

ঘ) প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ) মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন জাতীয় শব্দ।

পরিভাষা মুখ্যত বাঙালীর জন্য সংকলিত হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ যাতে তা সহজে বোধগম্য করতে পারে সেই চেষ্টা করা উচিত। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাববিনিময়ে সাহায্য হবে। সংস্কৃত শব্দ পরিভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া হিন্দী উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা বাংলার প্রতিবেশী তাই এই ভাষার শব্দও পরিভাষায় গৃহিত হতে পারে। আরবী ফারসী শব্দ ও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রচলিত বিদেশী শব্দের পরিভাষা ও গ্রহণ করতে হবে কারণ লেখক বলেছেন পরিভাষা মূলতঃ বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা ও শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশ শক্তি বৃদ্ধি করে।

পরিভাষা নির্ণয়ের জন্য প্রাবন্ধিক পথনির্ণয়েরও চেষ্টা করেছেন -

১) বহুকাল থেকে কতগুলি বিদ্যার চর্চা আছে যেমন - দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ,

গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা প্রচলিত আছে এই শব্দ সহজেই গ্রহণীয়। এবং বর্তমানে এই বিদ্যাগুলি চর্চা বৃদ্ধিতে যে নূতন পরিভাষা ইওরোপ সৃষ্টি করেছেন সেই পরিভাষার অনেক দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে।

২) আধুনিক বিদ্যা যা এদেশে পূর্বে অল্পাধিক চর্চিত হলেও বর্তমানে নূতন রূপ পেয়েছে যেমন - পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, মাণিকবিদ্যা। এদের জন্য অসংখ্য পরিভাষা আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন করে গড়তে হবে, হিন্দী ভাষা থেকেও শব্দ নেওয়া যায় তাছাড়া ইংরেজীতে প্রচলিত পারিভাষিক অনেক শব্দ আত্মসাৎ করতে হবে।

৩) বিশেষবাচক শব্দ যেমন - চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য সমান থাকবে। অর্বাচীন ও বহুপ্রচলিত নামও সমান থাকবে, যেমন - প্রশান্ত মহাসাগর। আবার ইংরেজী নাম গ্রহণীয় যথা - নেপচুন, আফ্রিকা, আটলাণ্টিক।

৪) দ্রব্যবাচক শব্দের দেশী নাম - স্বর্ণ, লৌহ বা সোনা লোহা থাকবে। রাসায়নিক ও খনিজবস্তু যন্ত্রাদিতে বাংলা পরিভাষার সঙ্গে ইংরেজী পরিভাষাগুলিকে গ্রহণ করব। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণ লিখব। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন - 'ভাষা মূলে সংকেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ় - অর্থ-বাচক সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রয়োগবিধি শিখব।

৫) বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন ও নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে যথা - ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ। তবে ইংরেজী নামও অনায়াসে নিতে হবে। যেমন - অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, গোরিলা, হাইড্রো, ব্যাকটিরিয়া।

৬) ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হতে পারবে। Survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী প্রতিশব্দ সহজে চলবে, যথা - গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড। তাছাড়া ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও শব্দ নিতে হবে যেমন - ফোকান, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক। লেখক বলেছেন ছাপাখানায় যেমন 'কম্পোজ করা' তেমনি রাসায়নিক ভাষায় 'অক্সিডাইজ' করা চলবে।

৭) বাংলা (সংস্কৃতে) কতগুলি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা - শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ, উদ্‌বৃত্ত, ছায়া, উপাঙ্গ, - পরিভাষার তালিকায় এইগুলিকে স্থান দিতে হবে।

৮) দেশী পরিভাষায় সর্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা যথাযথ বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। স্থলবিশেষে অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার ও সংকোচে ক্ষতি হবে না - যদি সংজ্ঞার্থ ঠিক থাকে। যথা - আঙ্গুলি Finger, Toe, fluid তরল, বায়ব।

৯) বিভিন্ন বিদ্যার প্রয়োগে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থভেদ হয়। এক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করা ভাল, কারণ বাংলা ও ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যেমন - sensitive (mind, balance, photographic plate). Sensitive শব্দে সমান ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করা ভাল। আবার বাংলা এমন শব্দও আছে যার ব্যঞ্জনা-বিশিষ্ট ইংরেজী শব্দ নেই, যেমন - 'বিন্দু' = drop, point, spot এখানে ইংরেজীর মত একাধিক শব্দের প্রয়োজন নেই।

বাংলা পরিভাষা প্রতিষ্ঠায় মুখ্য বা গৌণ ভাবে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক একটি নিবেদন জানিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। বহু বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির মৌলিক গবেষণার বিষয় থেকেও বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। সমিতিতে দু-চারজন সংস্কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে। হিন্দী-উর্দু পরিভাষা সম্বন্ধে যারা খবর রাখেন এমন ব্যক্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দী ভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকলে ভাল। এমন লোকের আবশ্যক যিনি সংস্কৃত শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রযোজ্যতা বিচার করতে পারেন। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত শব্দের মধ্যে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য বিচারের ভার সংকলন সমিতিকে নিতে হবে। মোটকথা পরিভাষা সংকলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হলেও শেষ নির্বাচন মিলিত সমিতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিভাষার আভিধানিক অর্থ সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা পরিভাষা রচনার বিশিষ্ট নিয়ম এবং কিভাবে তা করা উচিত সে বিষয়ের খুঁটিনাটি রাজশেখর বসু এই প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সংকেতযুক্ত যে শব্দ এই সুপ্রযুক্ত শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের বহুভাষিক রাষ্ট্র চরিত্রের মধ্যে একটা যুগসূত্র স্থাপনের সুযোগ তৈরী করবে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর অনেক কাছাকাছি বাঙালীর চলে আসার এক সেতু নির্মিত হবে।

পরিভাষার মত বিষয় লিখতে গিয়ে সমস্ত প্রদেশের সঙ্গে সম্প্রীতির আন্তরিক দিক লেখক অনুভব করেছেন।

সরকারী পরিভাষা (১৯৪৮)

প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘সরকারী কার্যে

ব্যবহার্য পরিভাষা' - প্রবন্ধটি সংস্কারমুক্ত হয়ে বিচারের চেষ্টা করেছেন। 'পরিভাষা' বিচারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে বলেছেন -

১) বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা ব্রিটিশ সরকারের জন্য সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। বিশেষ প্রদেশের জন্য হয়নি, তাই প্রাদেশিক কতগুলি প্রতিশব্দ দেখা যায়, যেমন - আদালত দারোগা, হিসাব অধিকারি, কানুন, কতোয়াল ইত্যাদি তবে ইংরেজী পরিভাষা সর্বভারতে সাধারণভাবে রাজকার্যে চলে।

২) যদি ইংরেজী শব্দ বর্জন করা হয় সেখানে এমন শব্দ নির্বাচন করতে হবে যা শুধু প্রদেশ বিশেষে নয় সর্বভারতে যেন গ্রাহ্য হয়। যদিও সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তা হয় নাই।

৩) সংবাদপত্র ও লৌকিক প্রয়োজনে কতগুলি প্রদেশিক প্রতিশব্দ - আইন, আদালত, দারোগা ইত্যাদি চলে। তেমনি ইংরেজী বাজেট, পুলিশ প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ ও চলবে কালক্রমে তা লুপ্ত ও হতে পারে। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র দেখিয়েছেন পূর্বপ্রচলিত ফারসী শব্দ অনেকগুলি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া বাঙালীর বোধ্য শব্দ সর্বভারতের উপযোগী নাও হতে পারে। বাংলায় সরবরাহ supply কিন্তু হিন্দীতে এ অর্থ চলে না।

৪) নূতন পরিভাষা সুবোধ্য হবে অর্থাৎ শুনিলে উদ্দিষ্ট অর্থের জ্ঞান হবে এমন আশা করা বৃথা। মূলত প্রয়োজনের জন্য আমরা নূতন শব্দ শিখি কালে সেই শব্দ ব্যবহার হতে হতে অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন - সিনেমা, ব্ল্যাক আউট, সেলট্যাক্স, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ, কালোবাজার, মুদ্রাস্ফীতি - দায়ে পড়ে মানুষ এগুলির অর্থ শিখেছে। সর্বভারতীয় পরিভাষার সমস্ত শব্দ সর্ব প্রদেশে

সুবোধ্য করা অসম্ভব তবে সর্ব প্রদেশে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা উচিত। নূতন শব্দ লোকে ধীরে ধীরে শিখবে যেমন ফারসী ও ইংরেজী শব্দ মানুষ আয়ত্ত করেছিল।

৫) বর্তমান ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ খাপছাড়া ভাবে নির্বাচন করলে চলবে না যেমন - শুধু Inspector নয় Sub-Inspector, Inspector General, Deputy Inspector General প্রভৃতির সুসংগত প্রতিশব্দ চাই।

৬) প্রকৃতি - প্রত্যয় - যোগে এবং সন্ধি সমাসের সাহায্যে সংক্ষেপে পরিভাষা রচনার অসামান্য শক্তি সংস্কৃত ভাষার আছে। ফারসী ভাষারও আছে, সংস্কৃত ফারসীর মিশ্রিত পরিভাষাও তৈরী হতে পারে তবে তা গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। সংস্কৃত এবং ফারসী ছাড়া পরিভাষা রচনার শক্তি অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষার নেই। সংস্কৃত ভাষা ভারতের সকল প্রদেশে মান্য এবং সংস্কৃত শব্দ প্রাদেশিক ভাষাতে ও দেখা যায়। তামিল তেলেগু সংস্কৃতজাত ভাষা না হলেও এই ভাষাগুলি অনেক সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করেছে। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ''পরিভাষিক শব্দের গঠন'' প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা ফাল্গুন ১৩৫৪) সংস্কৃত ভাষার উপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিদেশীর শাসনে ভারতীয় প্রজারা বিদেশী পরিভাষায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। নবভারতে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান না থাকলেও কালে মানুষ সংস্কৃতজাত পরিভাষা শেখবেন। এরজন্য ভাষা বা বুৎপত্তিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যেমন - আরবী ফারসী না জেনেও আমরা বহু আরবী ফারসী শব্দ শিখেছি।

৭) পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে পরিভাষা সংকলিত

হওয়ায় নির্বাচিত শব্দের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য ও আদর্শ সমান হওয়ায় ভবিষ্যতে মিলিত আলোচনায় একই শব্দাবলী গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৮) কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিতে ছাড়া সর্বভারতীয় পরিভাষা প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষা যদি হিন্দী হয় তবে সরকারী পরিভাষা সংস্কৃত প্রধান হবে তবে প্রবল মতভেদের ফলে বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা বজায় থাকবে। তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজভাষা নির্নীত হলে বোঝা যাবে সংস্কৃত ফারসী বা ইংরেজী কোন ভাষার প্রাধান্য বেশী হবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (১৩৫৮ / ১৯৫১)

বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়কে কিভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা যায়, লেখক এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধকে লেখক মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১) যারা ইংরেজী জানে না বা অল্প জানে, যেমন – অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক।

২) যারা ইংরেজী জানে বা ইংরেজী ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠকের সঙ্গে বিজ্ঞানের খুব একটা পরিচয় নেই। তারা সামান্য কয়েকটি ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ মাত্র শিখেছে —— টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, তাছাড়া অনেক স্থুল তথ্যও তারা জানে যেমন – জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চেয়ে আলিউমিনিয়ম হালকা, লাউ কুমড়ো জাতীয় গাছে দুরকম ফুল হয় —— সুশৃঙ্খল আধুনিক

বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে তারা প্রায় কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর পাঠক ইংরেজী ভাষার প্রভাব মুক্ত তাই বাংলা পরিভাষায় বিজ্ঞান শিখতে তাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরেজী শিখেছে তার পক্ষে বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করা একটু অসুবিধা। উদাহরণ স্বরূপ লেখক বলেছেন — যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে ধূতি পরা অভ্যাস করা কঠিন, স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকার রাজকার্যে দেশী পরিভাষা ব্যবহার করার ফলে অনেকে অসুবিধায় পড়েছেন। প্রথম শ্রেণীর পাঠকরা যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষা তাদের বাধা হয় না শুধু বিষয়টি যত্ন করে শিখতে হয়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকরা যখন বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও চেষ্টা বেশী আবশ্যক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান বাধা হল বাংলা পারিভাষিক শব্দ অধিক নেই।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, পরিভাষা রচনা সমবেত ভাবেই করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলণে সব শব্দকে গ্রথিত করা সম্ভব হয়নি তাই উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচনা না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজী শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত সমিতি বলেছেন যে, ''নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজী নামই বাংলা বানানে চলবে যেমন – অক্সিজেন, প্যারাডাই ফ্লোরোবেনজিন।''[৩৩] তাছাড়া ইংরেজী এবং International নাম ও বাংলায় চালানো যেতে পারে — ম্যালভাসী, ফার্ন, আরথ্রোপোডা ইনসেক্টা।

লেখকের মতে ''পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য।''[৩৪] লেখক আশা করেন যে কালক্রমে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার পথ সুগম হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনা পদ্ধতি তা অনেকেই আয়ত্ত করতে পারেন না, ''অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে।''[৩৫] এই

ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের মত হল —

১) ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যপ্তি বা Connotation বা বাংলা প্রতিশব্দের ও ঠিক তাই হওয়া চাই তাই তারা অনেক অদ্ভুত শব্দ ও প্রয়োগ করে থাকেন।

২) অনেক লেখক আবার তাদের বক্তব্যকে ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন — এতেও অনেক সময় রচনা উৎকট হয়ে পড়ে।

লেখক বলেছেন, পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে অনেকের মতে রচনা সহজ হয়। তবে স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। পারিভাষার মূল উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যখন প্রথম কোন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় তখন তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আলংকারিকরা শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন —অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।

অভিধা শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন – 'দেশ' এর অর্থ ভারত ইত্যাদি অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা' – এখানে লক্ষণায় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য' আভিধানিক অর্থ 'বন', কিন্তু 'অরণ্য রোদন' বললে ব্যঞ্জনায় অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাহিত্যে অলংকারের সার্থক প্রয়োগ অবশ্যই প্রশংসার বিষয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অলংকার প্রয়োগ কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে উপমা ও রূপক অলংকার কিছুটা ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জনীয়। মোটকথা, ''বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক''।[৩৬]

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে হলে বিজ্ঞান বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে 'বিজ্ঞান' এমন একটি বিষয় যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভর, যাতে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন জন একই মত–এ পৌঁছাতে পারে। এই বিষয়কে নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হলে প্রথমে বিজ্ঞান ও পরিভাষা নিয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট ও সরল ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি থাকে তবেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা সফল হবে।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে কি ধরণের ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। কথা প্রসঙ্গে আমাদের সরকারের দিকেও ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুক করে বলেছেন যে রাজকার্যে দেশী শব্দ ব্যবহার ও সাধারণ মানুষের হেনস্তার কথা।

ভাষাবিজ্ঞানী রাজশেখর বসু ইংরেজী ও বাংলা ভাষার মূল আভ্যন্তরিন পার্থক্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন যে ইংরেজী এবং বাংলার পারিভাষিক শব্দ গঠনে বিশেষত ইংরাজী বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের বিকল্প বা অনুবাদ হিসেবে বাংলা পারিভাষিক শব্দ নির্বাচনে লেখককে শব্দের Connotation জাত বহুমাত্রিকতাকে মনে রাখতে হবে না হলে বিকল্প অর্থবহ হয়ে উঠবে না। তাছাড়া বাংলা ভাষায় কোন কিছু লিখতে গেলে এই ভাষার গঠনরীতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

মনের ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বাংলায় লিখতে গেলে ঠিক কি ধরনের ভাষাকে গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে লেখক মনোজ্ঞ ভাষায় যুক্তিপরম্পরা সাজিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

আচার্য উপাচার্য (১৯৫৭)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, শব্দের অর্থ কালক্রমে বদলে যায়। সংস্কৃত অভিধানের অর্থ

এবং আধুনিক বাঙলা প্রয়োগে তা অল্পাধিক পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন - পাঠশালা ও বিদ্যালয়, বৈদ্য ও চিকিৎসক, ঘটনা ও যোজনা, অভ্যর্থনা ও প্রার্থনা, প্রণাম ও নমস্কার। অনেক শব্দের অর্থব্যপ্তি (connotation) আগের মত নেই যেমন - সাহিত্যে এর অর্থ প্রসারিত এবং কাব্যে এর অর্থ সংকুচিত হয়েছে। যেমন 'ধাতু' বললে সাধারণ লোক metal বোঝে, কবিরাজরা বোঝেন হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদান।

বর্তমান রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন অর্থের দিকে খেয়াল না রেখে বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। যেমন, স্নাতক অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্মচর্যসমাপ্তিসূচক স্নান করেছে, সমাবর্তন - ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। বর্তমানে গ্র্যাজুএট ও কনভোকেশন অর্থে এই শব্দগুলি চলছে। তেমনি নাচ গানের স্কুলকে বিদ্যালয় বললেও পাঠশালা এবং সেখানের শিক্ষককে গুরু মহাশয় বা অধ্যাপক বলা চলবে না।

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ - যে মহর্ষি দশসহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কুলপতি বলা চলে। মনুর বচন অনুসারে আচার্য শব্দের অর্থ - যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্য-এর অর্থ - learned, venerable (some what like the Eng. Dr.)। গুরু আর আচার্য প্রায় সমার্থক, সেজন্য তাঁর গুরুদেব উপাধিও সার্থক। কারণ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কেবল প্রতিষ্ঠাতা নন, নিজে অধ্যাপনাও করেছিলেন এবং সমগ্র শিক্ষার বিধায়ক ছিলেন, তাই আচার্য উপাধি সর্বতোভাবে তাঁর উপযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলর পদে রাষ্ট্রপতি থাকেন, তিনি শুধু বিশেষ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং প্রশাসন বা administration-এর কয়েকটি বিষয়ে সম্মতি দিয়ে থাকেন। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন চানসেলন-এর বাংলা আচার্য বলা যায় না কারণ এই দুই শব্দের মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত সাদৃশ্য নেই।

প্রিনসিপাল এর প্রতিশব্দ অধ্যক্ষও প্রাধান্য ও কর্তৃত্বসূচক। concise oxford dictionary-তে University chancellor - এর অর্থ titular head with vice-c acting অর্থাৎ চানসেলর পদবীতে প্রধান হলেও ভাইস চানসেলরই প্রকৃত কর্তা। প্রাবন্ধিকের মতে ভাইস চানসেলরকে উপাচার্য বলা আপত্তিজনক। ভাইস-চানসেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন তবে তাঁর প্রকৃত কর্ম তাঁর প্রশাসন। উপাচার্য শুনলে assistant professor মনে হয় তাই এই উপাধি শুধু অযোগ্য নয়, মর্যদাহানিকর।

সরকারী কার্যের পরিভাষা সংকলণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন যার সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কিছু পরিভাষা নির্ণয় করা হয়েছিল, যেমন - Senate অধিষদ্, Syndicate নিষদ্, Registrar নিবন্ধক, Vice Chancellor অধিপাল, Chancellor মহাধিপাল (এগুলির রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম.এ,কাব্যসংখ্যপুরাণ তীর্থ)। কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ, সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর অধিকর্তা, সংঘের প্রধান নেতা বা নিয়ন্তা যেমন অধিনায়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিয়ন্তা অধিপাল।

প্রাবন্ধিকের মতে, বিশ্বভারতীর তুল্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চানসেলর সেকালের কুলপতির সমপর্যায়ের। তাই চানসেলরকে আচার্য আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে লেখকের মতে তাঁর যথোচিত মর্যাদা বজায় থাকবে।

বাংলা ছন্দের শ্রেণী (১৯৪৫)

রাজশেখর বসুর কাছে 'পরিচয়'-এর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা জানতে চেয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্ররোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে পত্রযোগে প্রাবন্ধিক ছন্দের শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে ছিলেন, এটাকে ভিত্তি করে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

ছন্দের মূল উপাদান মাত্রা, তার বাহন syllable। সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে syllable ও হরফ দুইই বোঝায় তাছাড়া ইংরেজী ও সংস্কৃতের syllable একই রীতিতে নিরূপিত হয় না। তাই syllable এর জন্য নূতন প্রতিশব্দ প্রয়োজন। প্রবোধবাবু 'ধ্বনি' বলেছেন তবে Word 'শব্দ' syllable ধ্বনি তবে sound বোঝাতে কি লেখা হবে। লেখক বলেছেন কোনও এক প্রবন্ধে syllable-এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলেন। তবে এই প্রবন্ধে প্রবোধ চন্দ্র সেন 'ধ্বনি' শব্দটিকে মেনে নিয়েছেন।

'ধ্বনি' দুই প্রকার মুক্ত (open) ও বদ্ধ (closed)। মুক্তধ্বনির শেষে স্বরবর্ণ থাকে তা টেনে দীর্ঘ করা যেতে পারে যেমন। বদ্ধধ্বনির শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ বা ং ঃ বা দ্বিস্বর (diphthong) থাকে, যা দীর্ঘ করা যায় না, যেমন - উৎ, সং, তঃ, কই, সৌ। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরন্ত মুক্ত ধ্বনি এবং বদ্ধধ্বনি গুরু বা দুই মাত্রা গণ্য হয় (ধী, উৎ) এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তধ্বনি লঘু বা এক মাত্রা গণ্য হয় (ধি, তু)। বদ্ধ ধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই গুরু বা লঘু। বাংলা ছন্দের তিনটি শ্রেণীতে মাত্রানির্ণয় এক নিয়মে হয় না। ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম নেই, তা convention মাত্র এবং ভাষা ভেদে বিভিন্ন বা প্রচলনসিদ্ধ।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ -

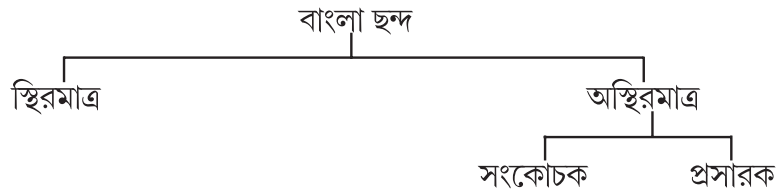

স্থিরমাত্র - যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলায় না, যেমন - বাংলা মাত্রাবৃত্ত। এতে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংস্কৃতে অক্ষর ছন্দ মাত্রাছন্দ বেশী চলে, এই দুই শ্রেণীই স্থিরমাত্র। সংস্কৃত ও বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাদৃশ্য থাকলেও বাংলা হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণভেদে প্রভেদ দেখা যায়। ইংরেজী ছন্দে accent-এর স্থান সুনির্দিষ্ট তাই তাকে স্থিরমাত্র বলা যায়। সংস্কৃত অক্ষরছন্দ এবং ইংরেজী ছন্দের এইটুকু মিল আছে, যেমন - ইন্দ্রবজ্রা, মান্দাক্রান্তা প্রভৃতিতে লঘু গুরু ধ্বনির অনুক্রম সুনিয়ন্ত্রিত তেমনি ইংরেজী iambus, trochee, প্রভৃতিতেও সেরূপ।

অস্থিরমাত্র - যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলাতে পারে। এর দুই শাখা -

ক) সংকোচক - বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বদ্ধধ্বনির মাত্রা সংকুচিত অর্থাৎ গুরু না হয়ে লঘু হয়। এই শ্রেণীর ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি শব্দের অন্তে গুরু কিন্তু আদি মধ্যে সাধারণতঃ লঘু। যেমন - 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত। এখানে - রাজ - মার - গীত গুরু কিন্তু নিস-তব-অভ-সং লঘু, তবে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন - 'বীরবর, ভারতমাতা' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে এবং 'জামরুল, মুসলমান' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দে আদ্য ও মধ্য বদ্ধধ্বনির সংকোচ হয় না, গুরুই থাকে। এই ব্যতিক্রম যুক্তাক্ষরের অভাবের জন্য হয়।

খ) প্রসারক - যে ছন্দে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু; আবার স্থানবিশেষে মাত্রা প্রসারিত

করে মুক্তধ্বনিকেও গুরু করা হয়। যেমন - 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান - এখানে সব বদ্ধধ্বনি গুরু, 'পড়ে' 'এল' ধ্বনিকেও টেনে গুরু করা হয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি গুরু। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, তবে বদ্ধধ্বনি কোথাও গুরু কোথাও লঘু। প্রসারক বা ছড়া জাতীয় ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু, কোথাও গুরু তবে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়ম সর্বাপেক্ষা সরল তাই প্রাবন্ধিক অন্য দুই শ্রেণীর ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি সুপ্রচলিত, প্রাবন্ধিক বলেছেন যে তিনি শুনেছেন প্রবোধবাবু এই নামটির প্রবর্তক, অন্য নাম দিয়েছেন 'যৌগিক ছন্দ'। মাত্রাগত লক্ষণ দেখে রাজশেখর বসু এর নাম দিয়েছেন 'সংকোচক ছন্দ'। 'অক্ষরবৃত্ত' নামের অর্থ হয়ত - এতে চরণের অক্ষর বা হরফের সংখ্যা প্রায় সুনিয়ত যেমন পয়ারের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর, মাত্রাসমষ্টি ও চৌদ্দ। এই অক্ষরের হিসাবটি কৃত্রিম। ছন্দ কানের ব্যাপার, মাত্রাবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দে পদ্যের লেখ্য রূপ অর্থাৎ বানান বা অক্ষরসংখ্যা লেখ্য হয় না, মাত্রা একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু পদ্যকার যখন সংকোচক ছন্দ রচনা করেন তখন শ্রাব্য ও লেখা রূপকে পরস্পরের অনুবর্তী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শব্দ ও অর্থ সমান হলেও 'ঐ' এক অক্ষর, 'ওই' দুই অক্ষর, পদ্যকার সংখ্যার উপর দৃষ্টি রেখে 'ঐ' বা 'ওই' লেখেন উচ্চারণ একজাতীয় হলেও স্থলবিশেষে শব্দের বানান অনুসারে মাত্রা বদলায় বা মাত্রার প্রয়োজনে বানান বদলায়। মাত্রাবৃত্তে 'শর্করা' আর 'হরকরা' দুইই চার মাত্রা, কিন্তু সংকোচক ছন্দে প্রথমটি তিন ও দ্বিতীয়টি চার মাত্রা, 'সর্দার, বাগ্দেবী' তিন অক্ষর কিন্তু মাত্রার প্রয়োজনে 'সরদার, বাগ্‌দেবী' লিখে চার অক্ষর করা হয়। দেখা যায় যারা গদ্যে 'আজও, আমারই' লেখেন তাঁরাও পদ্যে

'আজো, আমারি' বানান লেখেন পাছে অক্ষর বাড়ে।

পদ্যকার ও পদ্যপাঠক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যুক্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি রেখে মাত্রা নির্ণয় করেন। যদি বানান না বদলে 'সরদার'কে স্থানভেদে চার বা তিন মাত্রা করার রীতি থাকত তবে পাঠকের বিশেষ বাধা হত বলে লেখক মনে করেন না। তবে কারণ যাই হোক রীতি অন্যবিধ হরেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণ লিখেছেন - 'দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা'। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতির বশে অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখার জন্য 'দিগ্দিগন্তে' লিখেছেন, মাত্রাবৃত্ত লিখলে সম্ভবত 'দিগ্‌দিগন্তে' বানান লিখতেন।

তাই লেখক বলেছেন শুধু কানের উপর নির্ভর করে অক্ষরবৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা করা যায় না, বানান (অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ং ঃ ইত্যাদির অবস্থান অনুসারেও) করতে হবে। সেকালের কবিরা অক্ষর সংখ্যার উপর বিশেষ নজর দিতেন না তাই চৈতন্যচরিতামৃতে' এ দেখা যায় -

''সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ।

নীচশূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ।''[৩৭]

এরকম পদ্য লিখলে লেখক বলেছেন তা doggerel (নিকৃষ্ট কবিতা) বলে গণ্য হবে। প্রাবন্ধিক অনুমান করেছেন যে ভারতচন্দ্রের আমল থেকে মাত্রাসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যার সাম্য সম্বন্ধে পদকারগণ সতর্ক হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা সংস্কৃত অক্ষরছন্দের আদর্শে এই সাম্যরক্ষার চেষ্টা করেছেন। লেখক বলেছেন হয়ত পাঠককে সাহায্য করা এর একটি কারণ। ইংরেজী পদ্যেও syllable-সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য miss'd lack'd প্রভৃতি বানান চলে, যদিও কানে missed ও miss'd দুইই সমান।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, যদি বাংলায় যুক্তাক্ষর উঠে রোমান লিপি চলে তবে বর্তমান রীতি অন্য উপায়ে বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে, যেমন - 'সরদার, লেখা হবে sardar, কিন্তু মাত্রাসংকোচ বোঝার জন্য হয়ত সর্দার স্থানে Sa'dar লেখা হবে।

প্রবোধবাবু ছড়া-জাতীয় ছন্দের নাম 'স্বরবৃত্ত' দিয়েছেন, এখন তিনি এই ছন্দকে 'লৌকিক ছন্দ' বলেন। লেখক মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চান। প্রবোধবাবুর মতে, 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার পর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতি পর্বেচার ধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর (accent) থাকে; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর ব্যাকরণে অনুরূপ মত দিয়েছেন। উদাহরণ - 'সামনেকে তুই ভয় করেছিস পেছন তোরে ঘিরবে।' প্রাবন্ধিকের মতে, বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে কালিদাসতো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।' - এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি, কা-)তে accent দেওয়া যায় না। প্রতি পর্বে সাধারণত চার ধ্বনি আবার ব্যতিক্রমও হয় (শিখিয়ে দিত, তিন কন্যে)। ছড়াজাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ - শেষ পর্ব ছাড়া প্রতি পর্বে ছ মাত্রা কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ মাত্রা হতে পারে। এই ছন্দে মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে নিখেছেন, তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। 'বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি ছড়ায় 'বৃষ্টি' তিন মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে'ও তিন মাত্রা হয়েছে। মাত্রাপ্রসার হয় বলে লেখক এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চেয়েছেন।

পদ্যকার বানানের উপর দৃষ্টি রেখে সংকোচক ছন্দ রচনা করেন, হয়ত পাঠককে

সাহায্য করা এর উদ্দেশ্য। প্রসারক শ্রেণীর লৌকিক ছন্দ ও স্থানে স্থানে ধ্বনির মাত্রা বদলায় কিন্তু চিহ্ন দিয়ে পাঠককে সাহায্য করার চেষ্টা করা হয়নি। লেখক কারণ বলেছেন - সেকালে ছন্দ পণ্ডিত জনের অস্পৃশ্য ছিল, লিখে রাখাও হতনা, লোকে অতি সহজে মুখে মুখেই শিখত।

নিবিড় গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে রাজশেখর বসু ছন্দের লেখ্য ও শ্রাব্য বিষয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ব্যবহৃত ছন্দের বিভিন্ন বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ছন্দের সমৃদ্ধিশালী রূপ আমরা প্রথম ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রত্যক্ষ করি পরবর্তীকালে এই ছন্দের বৈজ্ঞানিক দিক এবং প্রচলন সিদ্ধতা বজায় রেখে ছন্দের বিশিষ্ট রূপ নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। ইংরেজী সংস্কৃত বাংলা ছন্দরীতিকে পাশাপাশি রেখে বিচার বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক এর গভীরে অবগাহন করেছেন।

বাংলা ছন্দের মাত্রা

প্রাবন্ধিক ছন্দের নির্ণয়ে নিজের কানের উপর নির্ভর করে সহজ সংস্কারবশে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

'ছন্দ' শব্দের ব্যাপক অর্থ হল - পর্বে পর্বে বিভক্ত সুপাঠ্য সুশ্রাব্য শব্দধারা, ধারার বিভাগ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরাম বা একান্বয়ভঙ্গ (break of monotony) আবার বিভাগগুলির সংগতি (harmony) ও চাই। প্রাবন্ধিক এখানে বিভিন্ন ছন্দের মাত্রাসংস্থান বা মাত্রাগণনার রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বাংলা ছন্দের আকৃতি সঙ্গে সংস্কৃত

ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায়, তাই লেখক সংস্কৃত রীতিরও উল্লেখ করেছেন।

হরফ ও অক্ষর

অক্ষর শব্দ সাধারণত দুই অর্থ চলে। প্রথম অর্থ হরফ, যেমন - অ ক্ ক কু কে কু ৎ ং ঃ। দ্বিতীয় অর্থ - syllable। এই প্রবন্ধে প্রথম অর্থে 'অক্ষর' না লিখে 'হরফ' লিখেছেন। দ্বিতীয় অর্থে 'অক্ষর' লিখেছেন। এক শ্রেণীর বাংলা ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলা হয়, 'অক্ষর' মানে হরফ্।

'অক্ষর' বা 'syllable' হল শব্দের নূন্যতম অংশ যার পৃথক উচ্চারণ হতে পারে। প্রতি অক্ষরে - শুধু একটি স্বর, একটিমাত্র স্বরের সঙ্গে একাধিক ব্যঞ্জন। অনুস্বার বিসর্গও ব্যঞ্জনস্থানীয়, অক্ষরের উদাহরণ- অ তু উৎ কপ্ দ্বী প্রাং স্তঃ। 'জল' সংস্কৃতে ২ অক্ষর - জল, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে 'জল' হসন্ত সেজন্য ১ অক্ষর। 'জলছবি' ৩ অক্ষর - জল-ছ-বি, 'জলযোগ' ৩ অক্ষর - জ-ল যোগ 'জলকেলি' ৪ অক্ষর - ক-ল কে-লি। 'অন্তঃপাতী' - অন্-তঃ-পা-তী কিংবা অ-ন্তঃ-পাতী। 'অধিষ্ঠাত্রী' - অ-ধিষ-ঠাৎ-রী কিংবা অ-ধি-ষ্ঠা-ত্রী।

সাধারণত, একটি স্বর থাকা অক্ষরের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু বাংলায় কতগুলি দ্বিস্বর অক্ষর চলে, যেমন - 'এই, বউ, খাও'। জোড়াস্বর বা dipthong ঐ ঐ বর্ণের তুল্য এবং অক্ষরে এক স্বর রূপে গণনীয়। অথবা দ্বিতীয় স্বরটি ব্যঞ্জনধর্মী, কারণ তার টান নেই।

মাত্রা, স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ, অক্ষরের লঘুগুরু ভেদ মাত্রা'র অর্থ - স্বরবর্ণের উচ্চারণকাল। ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রা নেই, ব্যঞ্জন যে স্বরকে আশ্রয় করে তারই মাত্রা আছে। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর এক মাত্রা, দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা। ছন্দে অক্ষরের লঘুগুরুভেদ ধরা হয়। সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘতা পায় - যদি তার পরে অনুস্বর বিসর্গ থাকে অথবা হস্‌চিহ্নিত

ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জন থাকে। তাছাড়া প্রয়োজনে চরণের শেষের স্বরও দীর্ঘতা পায় -

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।

বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পদান্তগোহপি বা।।[৩৮]

প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে পূর্ববর্তী স্বরের উপর তার প্রভাব থাকে না। বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের স্বাভাবিক ভেদ নেই, কেবল স্থান বিশেষে ঐ, ঔ দীর্ঘ হয়।

সংস্কৃত নিয়মে 'সূত' আর 'সুপ্ত' দুই-এর আদ্য স্বর দীর্ঘ, অন্ত্য স্বর হ্রস্ব, তাই আদ্য অক্ষরে সূ-সুপ-গুরু এবং অন্ত্য অক্ষর-ত লঘু। 'কারু, দীন, শৌরি' বং 'সত্ত্ব, দুষ্ট, দীপ্ত, সৈন্য' সবগুলি ঐপ্রকার, একটি বদলে অন্যটি বসান যায়। 'সূ-আর সুপ্ অক্ষরের ঊ উ আছে তাদের উচ্চারণকাল বা মাত্রা সমান। সূ-এর উচ্চারণে টান আছে, সুপ্-এ ঘাত, ধাক্কা বা সহসা ধ্বনিরোধ আছে তাই দুইই সমান নয়। যে স্বর সংস্কৃত স্বভাবত দীর্ঘ, তার নাম 'স্বতোদীর্ঘ' প্রাবন্ধিক নাম দিয়েছেন উদাহরণ - 'সূত' এর ঊ। যে স্বর হ্রস্ব হলেও যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে দীর্ঘ হয়, যেমন - 'সুপ্ত' - এর ঊ, তাকে লেখক 'পরতোদীর্ঘ' নাম দিয়েছেন। অক্ষরের এরূপ ভেদসূচক নাম - স্বতোগুরু, পরতোগুরু। সংস্কৃত ছন্দে এই ভেদ গ্রাহ্য হয়না। তবে কবি ধ্বনিবৈচিত্রের জন্য স্বতোগুরু বা পরতোগুরু অক্ষর নির্বাচন করে প্রয়োগ করেন। ছন্দঃশাস্ত্রে এই নিয়ম নেই কবির মাথা বা কাব্যশৈলীতে তা থাকে।

কোন শব্দের অক্ষরগুলি দুই রীতিতে পৃথক করে দেখানো যেতে পারে -

<u>প্রথম রীতি</u> - শব্দের যুক্তব্যঞ্জন না ভাঙা, যেমন - সু-প্ত, শ্র-দ্ধা-বান্। কিন্তু এতে পরতোদীর্ঘতা প্রকাশ পায় না। সু-'শ্র' এর স্বর পরতোদীর্ঘ কিন্তু অক্ষরে তার লক্ষণ নেই।

<u>দ্বিতীয় রীতি</u> - যথা সম্ভব যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষ করা যাতে স্বরের পরতোদীর্ঘতা (বা অক্ষরের

পরতোগুরুতা) অক্ষর দেখলেই বোঝা যায় - যেমন ঃ- সুপ-ত, শ্রদ্-ধা-বান। এই প্রবন্ধের উদাহরণে দ্বিতীয় রীতি দেখা যায়। কিন্তু যে বাংলা ছন্দে যুক্তব্যঞ্জনের জন্য পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় না সেখানে প্রথম রীতিতে অক্ষর ভাগ হয়েছে, যেমন ঃ- জ-ন্মে-ছিস।

সংস্কৃত ছন্দ

সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে - অক্ষরছন্দ বা বৃত্ত, এবং মাত্রাছন্দ বা জাতি। অক্ষরছন্দের সূত্র - চরণের হরফ সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা, মাত্রাসংখ্যা, অক্ষরবিন্যাস ও নিয়ত অর্থাৎ লঘুগুরুভেদে অক্ষর সাজাবার বাঁধা নিয়ম আছে। মিশ্র ছন্দ যেমন ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতি ছন্দ। মন্দাক্রান্তা অমিশ্র ছন্দ, সব চরণ সমান। অক্ষর ভাগ করে উদাহরণ -

কশ্-চিৎ কান্-তা-বি-র-হ-গু-রু-না স্বা-ধি-কা-রপ-প্র-মৎ-ত

শা-পে-নাস্-তং-গ-মি-ত-মহি-মা বর্-য-ভোগ্-য়ে-ণ ভর্-তুঃ।

প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা ১৭, মাত্রাসংখ্যা ২৭। লঘু অক্ষরের চিহ্ন ১, গুরু অক্ষরের ২ করে নীচে অক্ষর বিন্যাস দেওয়া হল -

২২ ২২১১১১১২ ২১২২১২২

২২২২১১১১১২ ২১২২১ ২২

মাত্রাছন্দের সূত্র - চরণের হরফ সংখ্যা অক্ষর সংখ্যা অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত।

সংস্কৃত পদ্যে চরণের শেষে মিল কম দেখা যায়। মাত্রাচ্ছন্দ যেমন পজ্ঝটিকায়, গীতগোবিন্দে 'কজ্বল পূরিতলোচনভারে' প্রভৃতি স্তোত্রে দেখা যায়। অক্ষরছন্দে অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে নিয়মিত, পর্যায়ক্রমে তার আবর্তন হয়, এটা হয়ত বা কারণ। এমন ছন্দের

মাধুর্য মিলের উপর নির্ভর করে না। মাত্রাছন্দে এই আবর্তনের অভাবে কিছু আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় তার পূরণের জন্যই মিলের চেষ্টা, তাছাড়া এও হতে পারে যে চরণের মিল করতে গেলে অক্ষচ্ছন্দের কড়া নিয়ম মানা শক্ত তাই পদ্যকার অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মাত্রাচ্ছন্দের শরণ নেন।

বাংলা ছন্দ

বাংলা ছন্দের তিনটি শ্রেণী - অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত। বাংলায় স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই কিন্তু ছন্দের শ্রেণীবিশেষে ঐ ঔ দীর্ঘ হয় এবং পরতোদীর্ঘ ও কৃত্রিমদীর্ঘ স্বরও চলে।

বাংলা ছন্দে সাধারণ লক্ষণ চরণের নিয়ত মাত্রাসংখ্যা যেমন - অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দে। আধুনিক ছন্দে চরণ অসমান তথাপি সুশ্রাব্যতার হানি হয় না, বরং বৈচিত্র্য হয়। এইসব ছন্দে সূত্র-নিরূপণ অসম্ভব। শুধু বলা যায় অমুক পদ্যের শব্দগুলির মাত্রা অমুক শ্রেণীর রীতিতে ধরা হয়েছে। তাও সর্বত্রস্থির করা যায় না।

অক্ষরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্তের উদাহরণ - সাধারণ পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি। এই শ্রেণীর ছন্দে প্রধান লক্ষণ - চরণের নিয়ত হরফ-সংখ্যা, যেমন - পয়ারের প্রতি চরণ ১৪ হরফ। স্বরান্ত ব্যঞ্জন, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, যুক্তব্যঞ্জন, অনেক জায়গায় অনুস্বার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়, কেবল বিসর্গ ধরা হয় না। 'ঐ' এক হরফ, কিন্তু 'ওই' দুই হরফ। সর্দার ৩ হরফ, কিন্তু 'সরদার' লিখে ৪ হরফ ও করা যায়, 'বাগ্দেবী' 'বাগ্‌দেবী' এক শব্দ কিন্তু প্রথমটি ৩ হরফ দ্বিতীয়টি ৪ হরফ ধরা হয়। মূল কথা - হরফের হিসাব একটা কৃত্রিম চাক্ষুষ উপায়। ছন্দের ব্যঞ্জনা মুখে, ধারণা কানে। তাই মুখ ও কানের সাক্ষ্য নিয়ে সূত্রনির্ণয় করতে হবে।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

যদি প্রত্যেক অক্ষর স্বরান্ত করে পড়া হয় তবে বলা যেতে পারে - প্রতি চরণে ১৪ হরফ, ১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রা। কিন্তু যদি সহজ রীতিতে পড়া হয় তবে হসন্ত উচ্চারণের উপর নজর রেখে এইভাবে অক্ষরভাগ করা যেতে পারে -

পা-খি সব ক-রে রব রা-তি পো-হা-ই-ল,

কা-ন-নে কু-সুম-ক-লি স-ক-লি ফু-টি-ল।

প্রথম চরণে ১২ অক্ষর, দ্বিতীয়তে ১৩। হসন্ত উচ্চারণের জন্য 'সব, রব,-সুম' এই ৩ অক্ষর পরতোগুরু, অন্য অক্ষরগুলি লঘু। দুই চরণেই ১৪ মাত্রা।

যুক্তাক্ষর দিয়ে রচিত পদ্যের উদাহরণ ব-হু প-রি-চ-র্যা ক-রি পে-য়ে-ছি-নু তো-রে, জ-ন্মে-ছিস ভ-র্তৃ-হী-না জ-বা-লার ক্রো-ড়ে।[১৩]

এখানে 'জন্মেছিস' ও 'জবালা' দুই শব্দের উচ্চারণ হসন্ত, তাই '-ছিস' '-লার' এই দুই অক্ষর পরতোগুরু। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে 'পরিচর্যা, জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা' শব্দে পরতোগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয় নি। প-রি-চ-র্যা ৪ টিই লঘু অক্ষর। চ-এর অ-কারকে চেপে হ্রস্ব করা হয়েছে ফলে 'পরিচর্যা'র উচ্চারণ কাল 'পেয়েছিনু'র সমান। 'জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা' ও এইরকম। উপরের উদাহরণ যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৪, অক্ষরসংখ্যা ১৪, ১২, মাত্রা সংখ্যা - ১৪, ১৪।

অক্ষরবৃত্তের রীতি - হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন বা পুর্বোক্ত দ্বিস্বর থাকলে অক্ষর পরতোগুরু হয় কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন বা ঐ ঔ থাকলে হয় না। বিসর্গের জন্যও হয় না, দুঃখ দুই অক্ষরই লঘু। শব্দের মধ্যে অনুস্বার থাকলে প্রায় হয় না, কিন্তু শেষে থাকলে হয়। 'সংখ্যা'র দুই অক্ষরই লঘু, কিন্তু সুতরাং' এর প্রথম দুই অক্ষর লঘু, শেষ

অক্ষর গুরু।

এই রীতিতে অক্ষরবৃত্তের সূত্র - চরণের হরফ-সংখ্যা নিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত এবং সাধারণত হরফসংখ্যার সমান, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত।

যুক্তব্যঞ্জনের জন্য অক্ষর গুরু হয় না, উপযুক্ত স্থলে কবিরা ঘাত বা ধাক্কা দিয়ে বৈচিত্র্য সাধন করে থাকেন। পাঠক ও বিশেষ বিশেষ স্বরে জোর দিয়ে ঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন।

মাত্রাবৃত্ত

এই শ্রেণীর ছন্দে যুক্তব্যঞ্জন আছে তাই পরতোগুরু অক্ষর প্রচুর দেখা যায়। অনুস্বার, বিসর্গ, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন এবং যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে অক্ষর পরতোগুরু হয়। যে অক্ষরে ঐ ঔ বা দ্বিস্বর আছে তাও গুরু তবে শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তার প্রভাব পূর্ববর্তী শব্দের অন্ত্য স্বরে প্রায় হয় না।

মাত্রাবৃত্তের সূত্র - চরণের হরফ-সংখ্যা অক্ষর সংখ্যা অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত। যথা -

পল্‌-ল-ব-ঘ-ন আম্‌-র কা-ন-ন রা-খা-লের খে-লা-গে-হ,

স্তব্‌-ধ অ-তল দি-ঘি-কা-লো-জল নি-শী-থ শী-তল স্নে-হ।

দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৮, ১৯, অক্ষর সংখ্যা ১৭, ১৬, মাত্রাসংখ্যা ২০, ২০।

অনেকের মতে, মাত্রাবৃত্তে যুক্তবঞ্জন ২ মাত্রা। তবে প্রাবন্ধিকের মতে এই উক্তি ভ্রমাত্মক। যেমন- 'পল্লব' শব্দের 'ল্ল' ২ মাত্রা বললে বোঝায় ল্ল এর অ-কার ২ মাত্রা। তা সত্য নয় কারণ প-এর অ-কারই ২ মাত্রা, কারণ পরে যুক্তব্যঞ্জন আছে। পল্‌-ল-ব এইভাবে অক্ষরভাগ করলে মাত্রাবিপর্যয় হয় না, অনুরূপ - উৎ-সা-হ, সং-হ-ত, দুঃ-স-হ।

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও সংস্কৃত ছন্দের সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ শুধু বাংলায় ঐ ঔ ছাড়া স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই। তবে বাংলা মাত্রাবৃত্তে যদি অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে এক করা হয় তবে সংস্কৃত অক্ষরছন্দের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

স্বরবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের নাম দিয়েছেন - 'প্রাকৃত ছন্দ'। গ্রাম্য ছড়া ও গানে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দে প্রতি চরণে স্বরবর্ণের সংখ্যা সমান রাখা হয়। তবে শ্রেষ্ঠ কবির লেখাতে ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং সেজন্য ছন্দঃ পাত হয় না। তাই নিয়ত স্বরসংখ্যাই এই ছন্দের লক্ষণ বলা যায় না।

স্বরবৃত্তের বিশিষ্টতা - মাত্রাসংখ্যা ঠিক

রাখার জন্য স্থানবিশেষে কৃত্রিম দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ -

বৃষ-টি প-র্ড়ে টা-পুর টুপুর-দেয় এ-র্ল বান,

শিব-ঠা-কু-রের বি-র্য়ে হ-বে' তিন কন্-র্নে দান।

দুই চরণের হরফ - সংখ্যা ১৭, ১৬, অক্ষরসংখ্যা ১৩, ১২ মাত্রাবৃত্তের রীতিতে গণিত মাত্রাসংখ্যা ১৮,১৭। এই হিসেবে দ্বিতীয় চরণে এক মাত্রা কম পড়ে, কিন্তু '´' চিহ্ন স্থানে প্রথম চরণে ২ টি স্বর এবং দ্বিতীয় চরণে ৩টি স্বর প্রসারিত করায় কৃত্রিমগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয়েছে, ফলে প্রতি চরণে ২০ মাত্রা হয়েছে। এই ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন - 'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে'। অর্থাৎ বৃষ্টি ৩ মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে' ও ৩ মাত্রা।

স্বরবৃত্তের সূত্র - চরণের হরফ-সংখ্যা, অক্ষরসংখ্যা, অক্ষর বিন্যাস অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত।

মাত্রাগণনায় মাত্রাবৃত্তের রীতি অনুসৃত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কৃত্রিমদীর্ঘ স্বর ও ধরা হয়। কৃত্রিমদীর্ঘ স্বর (বা কৃত্রিমগুরু অক্ষর) থাকায় মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রভেদ হয়েছে।

সংস্কৃত ও বাংলা বিভিন্ন ছন্দঃ শ্রেণীর লক্ষণ নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল -

লক্ষণ	সংস্কৃত		বাংলা		
	অক্ষর	মাত্রাচ্ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
স্বতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	নেই	অল্প*	অল্প*
পরতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	অল্প++	আছে	আছে
কৃত্রিমগুরু অক্ষর	নেই	নেই	নেই	নেই	আছে
হরফ-সংখ্যা	অনিয়ত	অনিয়ত	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
অক্ষর-সংখ্যা	নিয়ত	প্রায় অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
মাত্রা-সংখ্যা	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়তঙ্ক্র
অক্ষর-বিন্যাস	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত

* কেবল ঐ ঔ থাকলে

++ কেবল হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, দ্বিস্বর বা শব্দের শেষে অনুস্বার থাকলে।

অসম ছন্দ ও গদ্য ছন্দ

বাংলা তিন শ্রেণীর ছন্দে দেখা যায় যে একচরণের মাত্রা সংখ্যা পরবর্তী কোনও এক চরণের সমান। এইভাবে দু-একজোড়া চরণ মিলিয়ে দেখলে ছন্দের শ্রেণী ধরা পড়ে। অসমান চরণের ক্ষেত্রে শব্দাবলীর মাত্রাভঙ্গী দেখে ছন্দ নির্ণয় করা হয়।

গদ্য ছন্দের উদাহরণ -

১। আমার দুর্বোধ বাণী

বিরুদ্ধ বুদ্ধির পরে মুষ্টি হানি'

করিবে তাহারে উচ্চকিত

আতঙ্কিত।

২। অধরা মাধুরী পড়িয়াছে ধরা

এ মোর ছন্দ বন্ধনে।

বলাকা পাঁতির পিছিয়ে পড়া ও পাখি,

বসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।

৩। আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠিন কর্ম,

কিন্তু গৃহধর্ম

স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়,

মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।

উদ্ধৃতিগুলি ভঙ্গী থেকে বলা যেতে পারে প্রথমটি অক্ষরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত, তৃতীয়টি স্বরবৃত্ত। প্রত্যেকটিতে যেন সমান মাত্রার এক একরকম ছন্দ থেকে এক একটি পঙ্‌ক্তি তুলে এনে অসমান মাত্রার গোছা বাঁধা হয়েছে। এরূপ ছন্দকে মিশ্রছন্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু -

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে

অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান করে।

মনে হন স্বপ্নের ধূপ উঠছে

নক্ষত্রলোকের দিকে।

এই উদাহরণ স্বচ্ছন্দ, সাধারণ ছন্দের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ এরকম গদ্যছন্দের পরিচয় দিয়েছেন - ''এতে পদ্যের ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।''[৩৯]

সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ

সংস্কৃত ছন্দের সমস্ত নিয়ম বজায় রেখে কেউ কেউ বাংলা পদ্য রচনার চেষ্টা করলেও তা ঠিকমত হয়ে উঠেনি কারণ-স্বতোদীর্ঘ স্বর বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন তাতে রচনা কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

সংস্কৃত মাত্রচ্ছন্দের রীতিতে বাংলায় অনেক গান রচিত হয়েছে। যেমন - 'দেশ দেশ নন্দিত করি'।

'জনগণমন অধিনায়ক।' এইসব গানে স্বতোদীর্ঘ স্বর থাকলেও গানের তালের সঙ্গে দীর্ঘস্বরের টান সহজেই খাপ খেয়েছে।

বাংলা মাত্রাবৃত্তের নিয়মে শুধু পরতোদীর্ঘ স্বর অবলম্বন করে বাংলা কবিতা রচনায় সংস্কৃত অক্ষরছন্দের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু স্বতোদীর্ঘ স্বরের জন্য সংস্কৃত ভাষার লালিত্য তা অনুকরণে পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দে অক্ষরবিন্যাসের বাঁধাবাঁধি নেই, সেজন্য বাংলায় রচনা আড়ষ্ট না করেও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে অল্পাধিক সাদৃশ্য রাখা যেতে পারে। যথা রবীন্দ্রনাথের -

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী।

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

দুই চরণে যথাক্রমে ২০, ১৪ মাত্রা (চরণের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ)। অনুরূপ গীতগোবিন্দে

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী

হরতি দরতিমরিমতিঘোরম্।

'ছন্দ' পুস্তকে সংস্কৃত 'শিখরিণী অক্ষরচ্ছন্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা রূপান্তরের নমুনা প্রাবন্ধিক দিয়েছেন। এতে শুধু মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখা হয়েছে -

কেবলি অহরহ মনে মনে

নীরবে তোমা সনে যা খুশি কহি কত।

উক্ত প্রবন্ধটি বাংলা ছন্দের এক নির্মোহ, গভীর পরিক্রমা।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার বিখ্যাত পদকর্তাদের বিচিত্র ছন্দের উদাহরণে ধরা পড়ে লেখকের বহুপাঠী রসিক মনটি, যা সহজেই পাঠকের সমীহ আদায় করে নেয়।

ভাষার বিশুদ্ধি (১৯৪৩)

প্রাবন্ধিক বলেছেন, কোন মৃতভাষা যদি দৈবগতিতে জীবিত সমাজের সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয় তবে সেই ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধানের নিয়মের বন্ধন বিশেষভাবে মেনে চলতে হবে এবং লেখককেও সতর্ক থাকতে হবে। তাই মুসলমান রাজত্বকাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভারতের হিন্দু বিদ্বৎ সমাজের সাহিত্যের ভাষা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এক নিয়মের বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ করতে চায় না তাই সেযুগে তারা জীবন্ত প্রাকৃত ভাষা তাদের স্থূল প্রয়োজনে ব্যবহার করত। পৃথিবীর অন্য দেশেও এরূপ উদাহরণ দেখা যায়, যেমন - খ্রীষ্ট যুগের প্রথম দিকে দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন জাতীয় পণ্ডিত - সমাজে গ্রীক ভাষা সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। তেমনি মধ্যযুগে লাটিন ভাষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

প্রাবন্ধিক বলেছেন, বর্তমান ইংরেজী ও ইওরোপীয় ভাষায় যে গ্রীক ও লাটিন,

অংশ আছে তা বেশীর ভাগই বিকৃত। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গ্রীক লাটিন উপাদান মিলিয়ে অসংখ্য পরিভাষা তৈরী হলেও তার অধিকাংশ dog latin অর্থাৎ বিকৃত লাটিন। তবে লেখকের মতে আমাদের ভাগ্য ভাল যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরিভাষা সংকলণে এরূপ বিকৃত শব্দ গৃহিত হয় নি।

প্রাচীন গ্রীক লাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, সংস্কৃত সে অর্থে মৃত ভাষা নয়। প্রাবন্ধিকের মতে সংস্কৃত বাক্যে সাধারণ মানুষ কথা না বললেও অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত উচ্চারণের বিকার হলেও তার রূপ বদলায় না। ''আমরা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করি না, দরকার হলে সংস্কৃত রীতিতেই নূতন শব্দ এবং নূতন সমাসবদ্ধ পদ রচনা করি।''[৪০] বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিপুল সংস্কৃত শব্দ গৃহিত হয়েছে, তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''যিনি সাহিত্যচর্চা করতে চান তাঁকে কিঞ্চি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অন্তত সংস্কৃত প্রাতিপাদিকের গঠনও যোজনের মোটামুটি নিয়ম শিখতেই হবে।''[৪১]

শব্দ প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার চলে না কারণ সকলে নিয়মের অনুবর্তী না হলে ভাষা দুর্বোধ্য হয়। তাতে ভাবের আদান প্রদান ব্যাহত হয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সংস্কৃত শব্দে যে নিয়মের বন্ধন আছে তাতে শব্দ এবং তার অর্থ স্থির থাকে তবে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র বাধা পায় না।

১) প্রাদেশিক ভাষা বিভেদকে মুছে দেওয়া যায় সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে মিল তৈরী করতে পারে।

২) ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলিকে সমস্যা থেকে মুক্ত করতে সর্বভারতীয় ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত ভাষার প্রতি লেখক আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং এটা বর্তমানের সমস্যার সমাধান সূত্র বলা যায়।

ভাষা ভিত্তিক প্রদেশগুলি নিজস্ব ভাষা নিয়ে বর্তমান রাজনীতিতে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে নিজস্ব ভাষা রক্ষার জন্য অনেকেই আন্দোলনের পথে নেমেছেন অনেকে নতুন রাজ্য দাবী করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'ভাষা' নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে।

হিন্দী মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকায় বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষী মানুষ সহজে পরস্পরের ভাষা শিখতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় এই শব্দসাম্য যত বেশি হবে ততই লেখকের মতে সকলের পক্ষেই মঙ্গল। লেখকের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা এখানে দেখা যায়।

প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অল্প দিন এবং তাঁরা প্রায় সকলে সংস্কৃতজ্ঞ থাকায় তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃতিও অপপ্রয়োগ বেশী ঘটে নি। বর্তমান কালে সাহিত্যচর্চা খুব ব্যাপক এবং সকল অনেকস্থলে লেখকদের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ না হওয়ায় অনেক সময় অশুদ্ধ, অপ্রযুক্ত শব্দের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। লেখকের মতে এই উশৃঙ্খলতা উপেক্ষার বিষয় নয়, তবে এই ভুলকে প্রশ্রয় দিলে তা সংক্রামক রোগের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। যেমন - 'প্রামাণি'ক, অর্থে 'প্রামাণ্য', 'ইতিহাস' অর্থে ইতিকথা, আয়ত্ত 'আয়ত্তাধীন', 'কর্মসূত্রে স্থানে' 'কর্মব্যপদেশে'। 'উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, প্রসারতা, সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচিৎ' প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ চলছে, 'আধুনিকী' স্থানে 'আধুনিকা' 'প্রচুর' অর্থে 'যথেষ্ঠ', সংজ্ঞার্থ বা 'সংজ্ঞা' প্রচলিত হয়ে গেছে অনেকে কবিতার শ্রেণী অর্থে 'বলাকা' লিখছেন।

তাছাড়া প্রাবন্ধিক বলেছেন সংবাদপত্রে অনেক ভুল বানানের ব্যবহার বা ভাষার অদ্ভুত ব্যবহার দেখা যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য প্রাবন্ধিক বলেছেন, যেগুলি

অশুদ্ধ শব্দ বা অপ প্রয়োগ বার বার ছাপা হতে দেখা যায় সেগুলির জন্য একটা শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগবিধি দিয়ে যদি লেখকদের সতর্ক করা যেতে পারে। কয়েকটি বিলাতী পত্রিকায় ভাষার বিশুদ্ধি নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক ছাপা হয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি চালু করলে উপকার পাওয়া যাবে বা লেখকের মতে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

সর্বভারতীয় ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত তাই সংস্কৃত শব্দ যতবেশী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত হবে, ততই বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলির মধ্যে সমতা আসবে। হয়ত যে বিভেদের বীজ এই সমস্যার মূল কারণ তা একদিন লোপ পাবে এবং এই বিরাট সমস্যা থেকে এই পন্থাতেও আমরা সমাধান সূত্র খুঁজে দেখতে পারি।

তাই এই বিষয়ে রাজশেখর বসুর মতামত প্রাসঙ্গিকতার দাবী রাখে।

তথ্যসূত্র -

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১)		কথা সাহিত্য (রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা)		শ্রাবণ ১৩৬০	৫৯৪
২)	বসু রাজশেখর	প্রবন্ধাবলী	মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩	৩য় আগষ্ট ২০০৬ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১	৩৭৬
৩)	তদেব				৩৭৯
৪)	তদেব				৩৭৯
৫)	তদেব				৯৫
৬)	তদেব				৯৫
৭)	তদেব				১৮৮
৮)	তদেব				১৯০
৯)	তদেব				১৯১
১০)	তদেব				১৯২

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১১)	তদেব				৫৪
১২)	তদেব				৫৪
১৩)	তদেব				৫৬
১৪)	তদেব				২৭৫
১৫)	তদেব				৩৮৩
১৬)	তদেব				৩৮৪
১৭)	তদেব				১৪৯
১৮)	তদেব				১৫১
১৯)	তদেব				১৫১
২০)	তদেব				২২৯
২১)	তদেব				২৮৯
২২)	তদেব				১৩৩
২৩)	তদেব				১৩৪
২৪)	তদেব				১৩৫
২৫)	তদেব				১৩৫

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
২৬)	তদেব				১৩৭
২৭)	তদেব				১৩৭
২৮)	তদেব				৪৯
২৯)	তদেব				৫০
৩০)	তদেব				৫০
৩১)	তদেব				৫৭
৩২)	তদেব				৫৮
৩৩)	তদেব				১৬৮
৩৪)	তদেব				১৬৮
৩৫)	তদেব				১৬৯
৩৬)	তদেব				১৭০
৩৭)	তদেব				১০২
৩৮)	তদেব				৩৪৫
৩৯)	তদেব				৩৫২
৪০)	তদেব				৭৫
৪১)	তদেব				৭৬